চর্যাপদ

না বলা কিছু কথা

জাকারিয়া মাসুদ

নিরীক্ষণ

অধ্যাপক ড. মো. খোরশেদ আলম

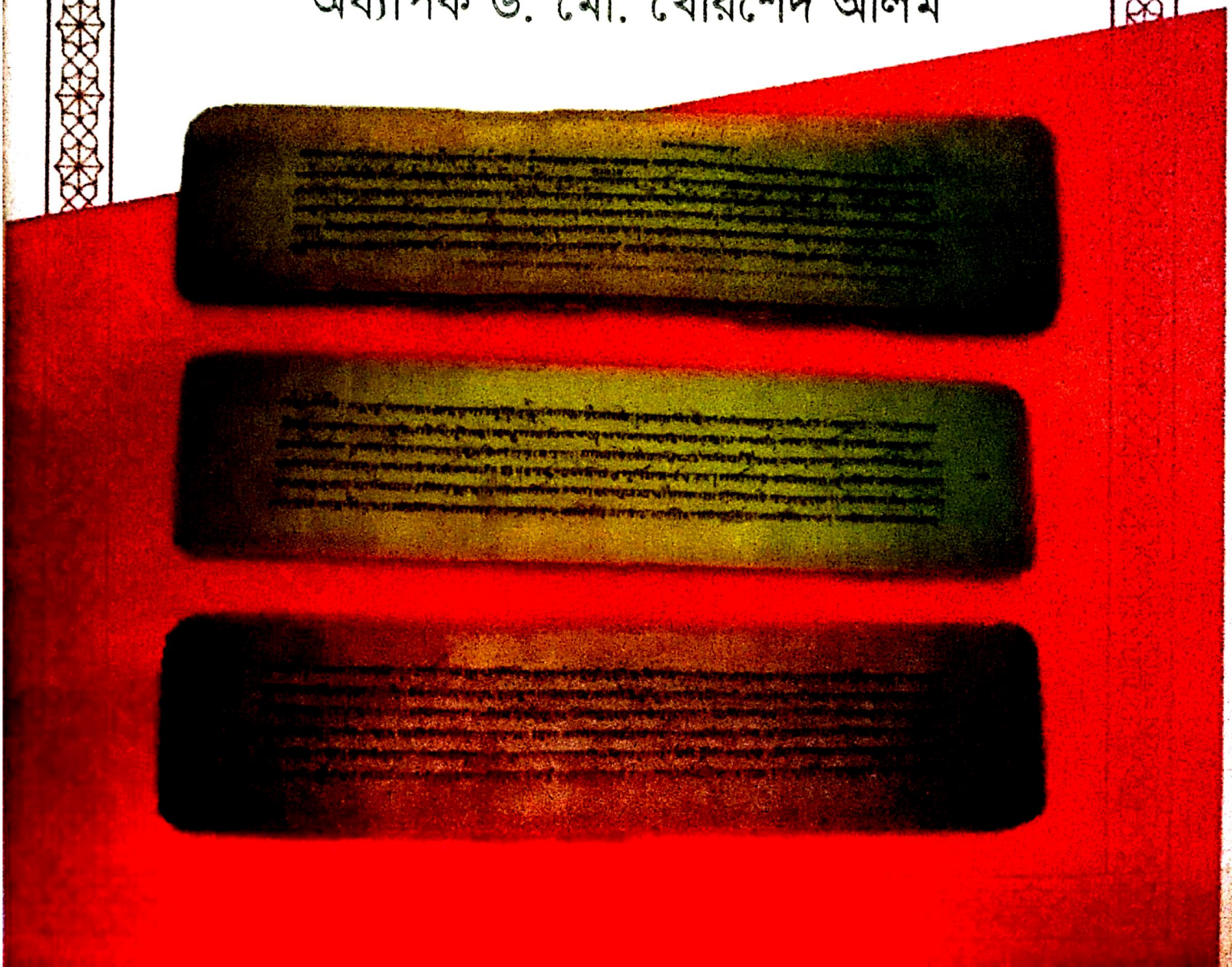

এক-পলকে

লেখকের কথা ৭

নিরীক্ষকের ইশারা ১০

চর্যাপদ আবিষ্কার ১৫

- গীতির সংখ্যা ১৯
- কবিদের পরিচয় ২০
- চর্যা নিয়ে বিদেশি ভাষায় চর্চা ২৭

নামকরণ ও রচনাকাল-বিতর্ক ৩১

- নামকরণ নিয়ে মতবিরোধ ৩১
- রচনাকাল নিয়ে বিতর্ক ৩৭
- শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুথিটির হালচাল ৪১
- গানগুলোর প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহ ৪৪

চর্যার ভাষা-বিতর্ক ৪৭

- 'সন্ধ্যা' নাকি 'সন্ধা' ৪৭
- চর্যায় ছিল না বাংলার বর্তমান হরফ ৫২
- চর্যার ভাষা নিয়ে মতবিরোধ ৫৪

- মৈথিলী ভাষার দাবি ৬৩
- ওড়িয়া ভাষার দাবি ৬৫
- অসমিয়া ভাষার দাবি ৬৭
- হিন্দি ভাষার দাবি ৬৯
- অন্যান্য ভাষার দাবি ৭০
- মতবিরোধের আরও কিছু দিক ৭১
- চর্যা কোনো একক অঞ্চলের সৃষ্টি নয় ৭৪
- অমীমাংসিত মীমাংসা ৭৭

চর্যার কবিরা বাংলা-ছাড়া হলেন যেভাবে ৮৪

- চর্যার সমকালীন শাসকগোষ্ঠী ৮৫
- সমকালীন রাজ-দরবারে অশ্লীলতার মাত্রা ৯১
- ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব.....৯৫
- চাপিয়ে দেওয়া ভাষা ৯৯
- চর্যার নিজস্ব সাক্ষ্য ১০১
- চর্যা হলো বাংলা-ছাড়া.....১০৬
- উপসংহার ১০৮

গ্রন্থপঞ্জি..... ১১০

নির্ঘণ্ট..... ১২০

Boier Somahar
Click here
to join our Telegram Channel

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইতিহাস নিয়ে জানার আগ্রহ বেশ আগে থেকেই। সে আগ্রহ থেকেই টুকটাক পড়াশোনার সূত্রপাত। পড়তে পড়তে এমন কিছু বিষয় সামনে এল, যার হাত ধরে চলে গেলাম এক ভিন্ন জগতে। সে জগত বড় বিস্ময়কর। যত গভীরে ডুব দেওয়া যায়, তত উঠে আসে রহস্যময় সব মণিমুক্তা।

ইতিহাস পড়ার আগে এমন অনেক বিষয়কেই স্বতঃসিদ্ধ মনে করতাম, যা আসলে একটি বিশেষ শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের পাঠ্য-বইতেও এর ছাপ ছিল প্রকট। এমনকি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বয়ানও এই ধারা থেকে বের হতে পারেনি। বদরুদ্দীন উমর (১৯৩১-২০২৫) তাই আক্ষেপ করে বলতেন—'১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক-প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয়নি। যেটা লেখা হয়েছে সেটা হলো সরকারি ভাষ্য, যা লেখা হয়েছে সেটা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ মিথ্যা।'[১]

এইসব মিথ্যা বয়ানকে 'মূলধারা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে নানাভাবে। আর তাতে সায় দিয়েছে প্রভাবশালী অনেক লোক। ফলে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও

---

১. *বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা*-য় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে উমর এই কথা বলেন। সূত্র : 'মুক্তিযুদ্ধের লেখা ইতিহাস ৯০ ভাগ মিথ্যা', *যুগান্তর*, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

আমাদের 'জাতীয় ইতিহাস' তৈরি হয়নি। 'জাতীয় ইতিহাস' নামে যা গেলানো হয়েছে, সেটা আসলে বিশেষ শ্রেণির ছকে-আঁটা আধিপত্যবাদী বয়ান মাত্র।

বাংলার ইতিহাস জানতে গিয়ে কখন যে চর্যাপদে ঢুকলাম, মনে নেই। চর্যা সত্যিই এক বিস্ময়কর সম্পদ। পাশাপাশি চর্যা নিয়ে যেসব ছক এঁকেছেন অতি-জাতীয়তাবাদীরা, সেটাও বিস্ময়কর। সেই বিস্ময় কাটাতেই নানান লেখাজোখা পড়তে থাকা। এক বই থেকে অন্য বই, এক থিসিস ধরে অন্য থিসিস, এক লেখক থেকে অন্য লেখক... বেশ লম্বা সফর ছিল চর্যাকে নিয়ে। সেই সফরে অর্জিত পুঁজিগুলোই বই আকারে এখন আপনাদের সামনে—*চর্যাপদ : না বলা কিছু কথা*।

নিজের ভুল এড়াতে বইটি নিরীক্ষণের জন্য পেশ করেছিলাম বাংলার কয়েকজন অধ্যাপকের সামনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন অধ্যাপক খোরশেদ আলম স্যার। অনেক ব্যস্ততার মাঝেও তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বইটি দেখেছেন। এরপর প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সংশোধনী দিয়ে আমাকে ঋণের জালে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা স্যারকে উত্তম বদলা দান করুন।

পক্ষপাতদুষ্ট আলোচনায় না গিয়ে নির্মোহ বিশ্লেষণের সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল আমাদের। অ্যাকাডেমিক নিয়ম-রীতি মেনে চলার ক্ষেত্রেও কোনোরূপ কার্পণ্য করা হয়নি। এর বাইরে একজন অ্যাকাডেমিশিয়ানের নিরীক্ষণ তো আছেই। এর বাইরে বইয়ের শেষদিকে একটা গ্রন্থপঞ্জি (bibliography) যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে—যাতে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত বইপত্র থেকে তথ্য-প্রমাণ আপনারা যাচাই করে নিতে পারেন।

লেখকের কথা

অনেক লম্বা সময় কারও সাথে থাকলে মায়া ধরে যায়। বাংলার ইতিহাসের সাথেও আমার তেমন মায়া জন্মেছে। সেই মায়া থেকে কিছু দায়ও এসে বর্তায়। নানা কারণেই সেটা ঘোচানোর হিম্মত করিনি এতদিন। তবে কালের আবর্তে মনে হয়েছে, সেই দায় কিছুটা হলেও মেটানো দরকার। তাই বাংলার ইতিহাস নিয়ে সিরিজ আকারে কিছু বই লেখার ইরাদা করেছি। জানি না, সেই খায়েশ পূর্ণ হবে কি না! দয়াময়ের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন সেই সুযোগ আমাকে করে দেন। এর মাধ্যমে পাঠককে ভিন্ন কিছুর স্বাদ দিতে পারব বলে আশা করছি।

শেষবেলায় উম্মে ফারিসের কথা মনে পড়ছে, যাঁর অধিকার নষ্ট করে শ্রম দিয়েছি বইটির পেছনে। সে যদি তাঁর হক আমার লেখালেখির জন্যে ছেড়ে না দিত, তবে হয়তো বইটি আলোর মুখ দেখত না। ছোট্ট ফারিসও লেখালেখির সময় দৌড়ে এসে কোলে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু বারবার ওকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা মা-ছেলে দুজনকেই নেক হায়াত দান করুন। সেই সাথে বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই কবুল করুন। আমিন।

জাকারিয়া মাসুদ

২৯ ভাদ্র, ১৪৩২ (১৯ রবিউল আওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি)

নিরীক্ষকের ইশারা

ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শনের দিশা খোঁজা সহজ নয়। সত্য যুক্তি ও তর্ক-বিতর্কে তা খুবই দুর্গম পথ। চর্যাপদ না হলে বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপকে ধরা কঠিন হতো। তবে তা শুধু বাংলা ভাষার আদিতম রূপ—হাল আমলে এ নিয়ে বিতর্ক ঘনিয়ে উঠেছে। অসমিয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার পণ্ডিতগণও চর্যাপদকে নিজেদের বলে দাবি করেছেন। তাদের দাবির পক্ষে শক্তপোক্ত যুক্তিও উপস্থাপন করেছেন। কখনো অতিজাতীয়তাবাদের শেকলে নিজেদেরকে বন্দি করেছেন। আসলে যে কোনো একটি ভাষার বিকাশ সময় নির্ভর। বলা চলে, চর্যাগীতি যে সময়ের সাহিত্য তা সেকালের ভারতীয় ভাষা বিকাশের একটা মধ্যপর্যায়। তখনো বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার জন্ম হয়নি। সময়ের বিবর্তনে সেগুলো আধুনিক ভাষার রূপ পেয়েছে।

চর্যাপদের ভাষা নিয়ে এ কালে যারা প্রশ্ন তুলেছেন তাদের মধ্যে গবেষক জাকারিয়া মাসুদ একজন। *চর্যাপদ : না বলা কিছু কথা* গ্রন্থে তিনি চর্যাগীতি প্রসঙ্গে চিন্তা-জাগানো কিছু বিষয় উত্থাপন করেছেন। নাতিদীর্ঘ এই গ্রন্থটি পাঠকের নজর কাড়বে বলে প্রত্যাশা করা যায়। নতুন কিছু জানার অর্থ প্রশ্ন করা—গবেষক তা সমর্যাদায় জারি রেখেছেন। সন্দেহের যে বীজটি ভ্রূণ আকারে ছিল, তাকে চারাগাছে পরিণত করেছেন।

অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন। প্রমাণ ও তথ্যসূত্রও হাজির করেছেন নিয়ম অনুসরণ করে। গ্রন্থটি পাঠ করলে বোঝা যাবে, তিনি গবেষণার প্রচলিত জটিল ভাষার আশ্রয় নেননি। তার বদলে বেশ যোগাযোগপ্রবণ ভাষা ব্যবহার করেছেন। এই গদ্য গভীরতার খাদে নামেনি, আবার দীপ্তি হারিয়ে তরলায়িতও হয়নি। চর্যাপদ আবিষ্কারের কথা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাষার দাবি ও মতবিরোধগুলো তিনি যৌক্তিকভাবে একে একে তুলে ধরেছেন। চর্যার একক অঞ্চলের দাবির বিষয়টি, এমনকি চর্যার কবিদের বাংলা-ছাড়া হওয়ার সমাজ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তাঁর সচেতন দৃষ্টি এড়ায়নি। ব্যক্তিগত বিরাগ থেকে তিনি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ওপর এসবের দায় বর্তাননি। ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সত্যাসত্য যাচাই করার পথও বন্ধ রাখেননি। প্রত্যাশিত যে, ভবিষ্যতের পাঠক ও গবেষকগণ এ থেকে ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চিন্তার অনুপ্রেরণা পাবেন।

চর্যাপদের ভাষাকে শুধু বাংলা বলাটা একপেশে। একমত হওয়া যায় যে, চর্যাপদের ভাষা নির্দিষ্ট যুগের ভাষা দ্বারা প্রভাবিত। সময়টা আধুনিক ভাষা গঠনের পূর্বাবস্থা। প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ প্রভৃতি স্তরে মধ্যপন্থি একটা ভাষা জন্ম নিচ্ছে। এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলে গমনাগমন করছে। চর্যাপদ রচয়িতা সিদ্ধাচার্যরাও এক স্থানের মানুষ ছিলেন না। অনেকগুলো ভাষা অঞ্চলের মানুষ একত্র হলে তাদের মধ্যে একটা মধ্যবর্তী ভাষা তৈরি হয়। 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা'র মতো তা সবার সঙ্গে কমবেশি যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম। চর্যাগীতির ক্ষেত্রে সে বাস্তবতাই ঘটেছে। সত্যের উপস্থাপনা সবসময়ই জরুরি—জোর করে কোনো কিছু চাপানো নয়, মিথ্যাকে সত্যের

তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠাপন করাও নয়।

কিছু চর্যায় রয়েছে সমকালীন আঞ্চলিক ভাষা-উপভাষার প্রভাব। আধুনিক বাংলা ভাষার সঙ্গে এর তুলনা করা কঠিন। সহজযান বৌদ্ধধর্মের কাব্যরূপ এতে প্রকাশিত। কিছু চর্যা সনাতন ও লোকধর্মের প্রভাবে পুষ্ট। কখনো চর্যাগুলোর সঙ্গে মিশে গেছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন, নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের স্পর্শ। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান শাখার 'সহজযান' অপেক্ষাকৃত সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক। হয়ত সে প্রভাবও এর পদগুলোতে পড়েছে। অন্যদিকে চর্যাপদের রচনাকালও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। তা গবেষকদের নির্ধারিত কালসীমার গণ্ডি পেরিয়ে গেছে। কিছু গবেষক এগুলোর প্রাচীনতা স্বীকার করেছেন, তবে অনেকে এর নবীনতার বিষয়টি নিয়ে সন্দিহান। বিতর্কটির প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা রয়েছে বর্তমান গ্রন্থে।

তবে পরিপ্রেক্ষিত যেমনই হোক চর্যাপদ সমাজকর্তা, কৃষক, ব্যাধ, শবর, সন্ন্যাসী, হস্তশিল্পী নানান শ্রেণিপেশার মানুষে মুখরিত হয়ে উঠেছে। চরিত্রের এই বৈচিত্র্যের বাইরে এর সমাজ-সাংস্কৃতিক কাঠামোরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তা থেকে সমসাময়িক কালের ক্ষমতাচর্চার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়। প্রাচীন ভাষার ব্যাখ্যা ও চৈতন্যের রহস্যও ভাবনার আবেশ তৈরি করে। অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকাররা চর্যাগুলোর অর্থ বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। কাজেই, চর্যাপদের বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক বিশ্লেষণ অনির্ণীতই থেকে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে চর্যাপদ নিয়ে রহস্যের পর্দা ভেদ করা কঠিন। এতে রয়েছে নানা ঝুঁকিও। তবে চর্যা নিয়ে অতিজাতীয়তাবাদী

কুতর্কে একা বাঙালিরা দায়ী নয়। বিতর্কের মূল জায়গাগুলোও বিচিত্র; যেমন—রচয়িতা ও রচনার সময়, ভাষা ও লিপি, ধর্মীয় ও দার্শনিক অর্থ, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ব্যাখ্যা ও অনুবাদে সমস্যা প্রভৃতি।

স্বল্প আয়তনের মধ্য দিয়েও *চর্যাপদ: না বলা কিছু কথা* গ্রন্থটি চর্যাপদের বিচিত্র প্রান্ত স্পর্শ করেছে। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে লেখকের চিন্তা ও বিশ্লেষণ সত্যিই প্রশংসনীয়। আশা করা যায়, বইটি পাঠকের জন্য চিন্তার খোরাক হয়ে উঠবে। ভাই জাকারিয়া মাসুদের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান মানুষকে আলোর পথের পথিক করে তুলবে।

ড. মো. খোরশেদ আলম,
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

০১

চর্যাপদ আবিষ্কার

আগে লোকেরা ভাবত, বাংলা বুঝি ভাষা-সাহিত্যের মাধ্যম নয়। 'উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজী, না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়।'[১] ১৮৬৬ সালের পয়লা জানুয়ারি এই মনোভাব নিয়েই হরপ্রাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) যোগ দিয়েছিলেন বেঙ্গল লাইব্রেরিতে। সেখানে গিয়েই মূলত তাঁর ভুল ভেঙেছিল।

ওই লাইব্রেরিতে তিনি অনেক প্রাচীন বাংলা পুস্তক দেখতে পান। তাঁর আগ্রহ জেগে ওঠে। তিনি ভাবতে থাকেন, লিখিত আকারেই যদি এত পুস্তক পাওয়া যায়, তবে হাতে-লেখা বই না-জানি আরও কত আছে। তখন থেকেই লিখিত পুস্তক খোঁজার অদম্য আগ্রহ জন্মায় শাস্ত্রীর মনে। বিশেষ করে হাতে লেখা পুথির প্রতি তাঁর ছিল অন্যরকম টান। বিভিন্ন স্থান থেকে পুথি জোগাড় করে অনুলিপি করতেন তিনি।

এভাবে একদিন তাঁর হাতে এল—*শূন্যপুরাণ*। রামাই পণ্ডিতের লেখা। ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতির বর্ণনা ছিল সেখানে।

---

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, (ভূমিকা)

সেই সাথে ছিল রামাই পণ্ডিতের লেখা একটি লম্বা ছড়া। পুথি থেকে জানা যায় ঠাকুর-মশাই অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। তার জুলুম থেকে বাঁচার জন্য সেবকগণ মুক্তি কামনা করল। ব্যস, ঠাকুরের রাগ আর দেখে কে! 'তিনি যবনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণদের সর্ব্বনাশ করিলেন।'[২]

ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, এটা তিনি পরে আবিষ্কার করেছিলেন। সেই থেকেই তাঁর নেপাল যাওয়ার সাধ জাগল। নেপালে হিন্দুরাজার অধীনে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা কী, সেটা তিনি স্বচক্ষে দেখতে চাচ্ছিলেন। ১৮৯৭ সালে বৌদ্ধ লোকাচার-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি প্রথমবার সফর করেন নেপাল। এরপর দ্বিতীয়বার নেপাল ভ্রমণের সময় (১৮৯৮) কিছু বৌদ্ধধর্মীয় পুথিপত্র সংগ্রহ করেন। নেপালের দরবার লাইব্রেরি থেকে তাঁর হাতে আসে 'দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা' ও 'সুভাষিত-সংগ্রহ'। কিন্তু এর আগামাথা কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। এরপর তৃতীয়বার নেপাল যান ১৯০৭ সালে। ওই সময় 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক একটি পুথি তাঁর হাতে আসে। এতে ছিল কীর্তনের গান ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা টীকা। এর সাথে আরও কিছু পুথির সন্ধান পান তিনি।[৩]

প্রথমদিকে শাস্ত্রী মহাশয় বুঝে উঠতে পারেননি—কত মূল্যবান বস্তু তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। যখন বুঝতে পারলেন, তখন আর দেরি করলেন না। চলেন এলেন স্বদেশে। এরপর '১৯১৬ সনে লালগোলার জমিদার যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের অর্থসাহায্যে এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়*,

২. প্রাগুক্ত

৩ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫৮

সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব—এ চারখানি পুথি একত্রে হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা নামে প্রকাশিত হয়।[৪]

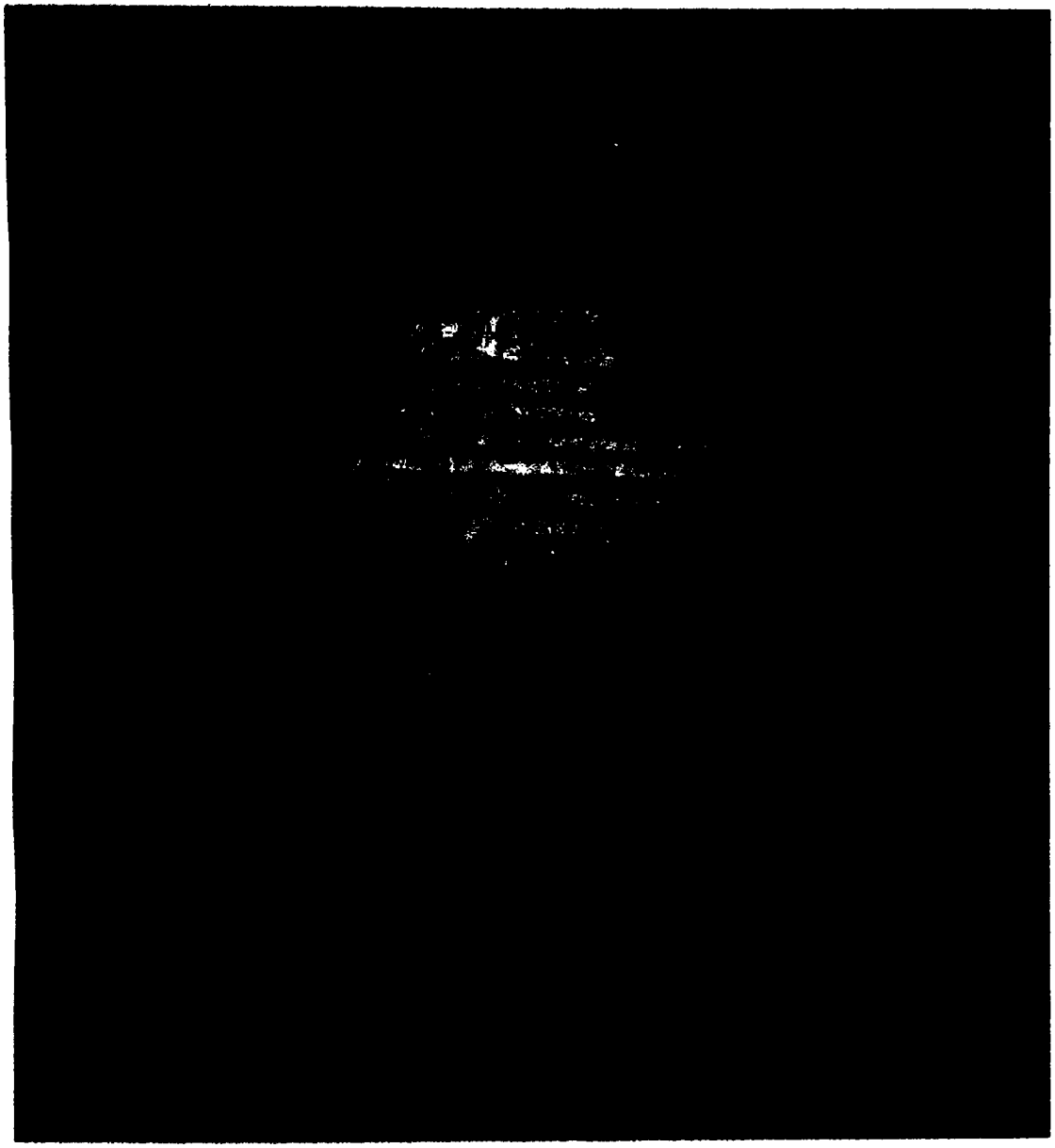

চিত্র ১: রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত মূল চর্যাপদ এর ধ্বংসাবশেষ।

৪ আহমদ শরীফ, 'বাংলা সাহিত্যের সূচনা: চর্যাগীতি', আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭; ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, পৃ. ৬

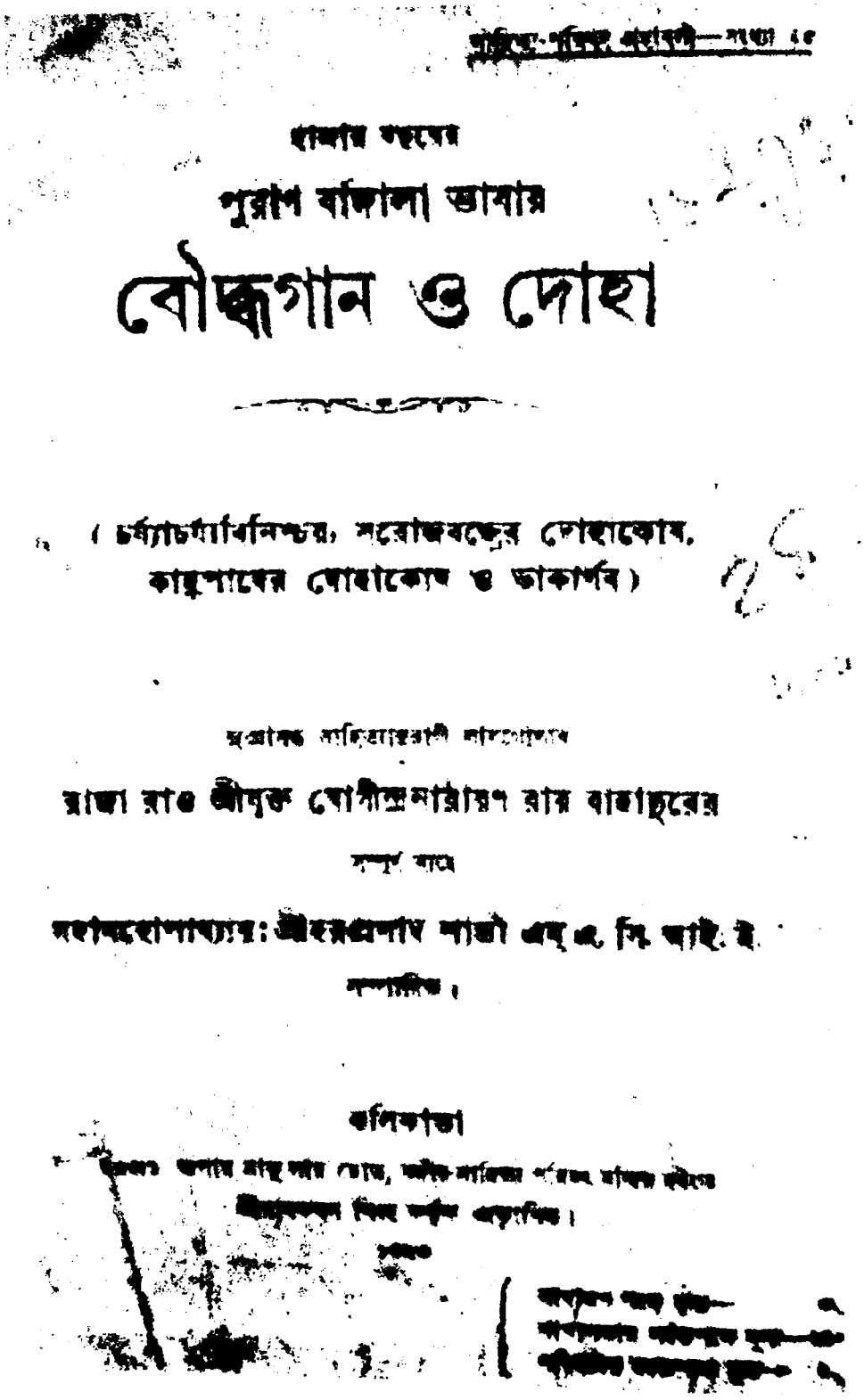

সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ৫৫

হাজার বছরের

পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধগান ও দোহা

(চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নুপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব)

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সম্পূর্ণ ব্যয়ে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি. আই. ই.

সম্পাদিত।

কলিকাতা

চিত্র-২ : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* এর প্রথম মুদ্রণ।

গীতির সংখ্যা

অনেকের ধারণা চর্যার মূল গ্রন্থে মোট গান ছিল ৫০টি। 'কতকগুলি পাতা না থাকায় ২৩ সংখ্যক গানের শেষাংশ এবং ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক গান তিনটি সেখানে পাওয়া যায় নি।'[৫] ফলে প্রাপ্ত পূর্ণ গানের সংখ্যা ৪৬, আর অসম্পূর্ণ গানের সংখ্যা একটি। সব মিলিয়ে মোট গান দাঁড়ায় সাড়ে-ছেচল্লিশটিতে।[৬] পুথির মাঝখানে ৩৫ থেকে ৩৮ নম্বর পৃষ্ঠা এবং ৬৬ নম্বর পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। ফলে প্রাপ্ত পুথির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪। কিন্তু পরে জানা গেছে, এই হিসাবে কিছুটা গরমিল রয়েছে।

'দশম চর্যার মূল পাঠ ও টীকার পরে এবং একাদশ চর্যার আগে লাড়ীডোম্বীপাদের একটি চর্যা ছিল... কিন্তু টীকার অভাবে গানটি লিপিকর বর্জন করেছেন।'[৭] অর্থাৎ, ১১ নম্বর গান বাদ দিয়ে সংকলক মোট ৫০টি গান লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু 'অজ্ঞাত কারণে' সেই কথা উল্লেখ করেননি।[৮] 'কেবলমাত্র "লাড়ীডোম্বীপাদানাম্, সূনেত্যাদি। চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।" এই ব'লে টীকাকার কর্তৃক অব্যাখ্যাত পদটির অস্তিত্বের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন মাত্র।'[৯] ফলে বাদ-পড়া ১১ নং গীতি-সহ হিসেব করলে চর্যার মোট পদ দাঁড়ায় ৫১-তে। অর্থাৎ, যেখান থেকে চর্যার লিপিটি কপি করা হয়েছে, সেই মূল পুথিতে গান ছিল

---

৫. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ২৩৯

৬. মাহবুবুল হক, *চর্যাগীতি পাঠ*, পৃ. ২১৯

৭. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১১

৮. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ৪

৯. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ৪৯-৫০

একান্নটি।[১০]

কবিদের পরিচয়

চর্যার কবিগণ পরিচিত ছিলেন 'সিদ্ধাচার্য' নামে।[১১] বৌদ্ধধর্মের বজ্রযানী ও সহজযানী শাখার আচার্যগণই সাধারণত এই নামে অভিহিত হতেন। তিব্বতি ও ভারতীয় কিংবদন্তিতে এঁরা 'চৌরাশি সিদ্ধা' নামে পরিচিত। তবে তাঁদের সঠিক পরিচয় জানা যায়নি।[১২] চর্যার সিদ্ধাচার্যরা 'সেই চৌরাশি সিদ্ধাচার্যদের অন্তর্ভুক্ত কি না তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে'।[১৩] সম্ভবত 'মীননাথ প্রবর্তিত সহজযান (তান্ত্রিক বৌদ্ধ মত)-এর অনুসারী ছিলেন'।[১৪] মোট ২৪ জন[১৫] সিদ্ধাচার্য বা কবির নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন—লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কাম্বলাম্বর, ডোম্বী, শান্তি, মহিন্তা, বীণা, সরহ, শবর, আজদেব, ঢেণ্ঢণ, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জয়নন্দী, ধাম, তান্তী পা ও লাড়ীডোম্বী।[১৬] এঁদের

---

১০. নির্মল দাশ (১৯৮২), *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃষ্ঠা ১৩; সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ৪৯-৫০; মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ৪; আহম্মদ শরীফ, 'বাংলা সাহিত্যের সূচনা: চর্যাগীতি', আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, ৩৩৯; ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*, পৃ. ৪৪

১১. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১

১২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৭

১৩. শামসুল আলম সাঈদ, *চর্যাপদ : তাত্ত্বিক সমীক্ষা*, পৃ. ২৭

১৪. অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, পৃ. ১৬; মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ১২

১৫. নির্মল দাশ অবশ্য ২৩ জনের কথা বলেছেন। কারণ, তিনি লাড়ীডোম্বীকে হিসেবের বাইরে রেখেছেন। দ্র.: নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ২০

১৬. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ৩

মধ্যে লাড়ীডোম্বীর পদটি পাওয়া যায়নি।[১৭] ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক পদগুলো হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিতে না থাকলেও ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী আবিষ্কৃত তিব্বতি অনুবাদে উল্লিখিত হয়েছে।[১৮] এগুলোর রচয়িতারা হলেন—কাহ্ন, তান্তী ও কুক্কুরী।[১৯]

একটা কথা বলে রাখা ভালো, গীতিকারদের নাম উল্লেখের ব্যাপারে টীকাকাররা মাঝে মাঝেই গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছেন। যেমন ১৭ নং গানের টীকায় রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বীণাপাদের নাম। কিন্তু মূল গানে 'বীণা' শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে সেটিকে গীতিকারের নাম হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন। কেননা, টীকাকারের উক্তি ছাড়া আর কোথাও এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ২৮ ও ৫০ নং গানের টীকায় 'শবর' উল্লিখিত হয়েছে কবি হিসেবে। অথচ 'শবর' পদটি যেভাবে আছে তাতে সেটি মনে হয় না। কিছু কিছু জায়গায় কবির নাম মূল গানে একরকম, টীকায় আরেক রকম। যেসব গানের ভণিতায় 'পা' রয়েছে, সেগুলোকে কবির নিজের নাম বলে গ্রহণ করায় অসুবিধা আছে। 'নামের সঙ্গে পা-এর উল্লেখে বোঝা যায় যে এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত পদকর্তা ভণিতায় নিজের নাম গোপন করে গুরুর নাম উল্লেখ করেছেন।'[২০] এর বাইরে আরও কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক ড. নির্মল দাশ (১৯৪০-২০১৬) :

---

১৭. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ১০

১৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬০

১৯. অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, পৃ. ১৩; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৭

২০. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ২১

> ভণিতায় অনেক ক্ষেত্রে চর্যাকারের প্রকৃত নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ৩৭, ৪৪ সংখ্যক চর্যাগানে যথাক্রমে যে তাড়ক ও কঙ্কণ ভণিতা দুটি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি কবির প্রকৃত নাম নয়। সেকালে কবিরা অনেকক্ষেত্রে... ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তাই তাড়ক ও কঙ্কণ সম্ভবত কবিদের উপহার-লব্ধ ভূষণের নাম, নিজের নাম নয়।[২১]

একই কথা খাটে ঢেণ্ঢণপা-এর ক্ষেত্রেও। 'নামটিকেও ছদ্মনাম বলেই মনে হয়।' এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর গান থেকেই। তাঁর গানে যে 'ঢেণ্ঢণ' বা ধূর্ততার পরিচয় আছে, সেটি মূলত তাঁর 'রীতিচরিত্রেরই পরিচায়ক, ব্যক্তিচরিত্রের নয়'। দাশ বলেন, 'ইনি হয়ত এই ধরনের অর্থচাতুর্যপূর্ণ গান লিখতেই অভ্যস্ত ছিলেন এবং সেইজন্য তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।'[২২]

সাধারণভাবে লুইপাদকে আদি সিদ্ধাচার্য মনে করা হয়।[২৩] ১ ও ২৯ সংখ্যক পদ দুটি তাঁর রচিত।[২৪] 'কিন্তু আচার্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন লুইপাদের পরিবর্তে সরহপাদকেই আদিসিদ্ধাচার্য বলার পক্ষপাতী। তাঁর মতে লুইপাদ অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ সিদ্ধাচার্য। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরহপাদ ৮ম শতাব্দীর ব্যক্তি এবং চর্যাগানগুলি ৮ম-১২শ শতাব্দীর রচনা।'[২৫] অন্যদিকে ড.

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ২২

২৩. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ৫

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২৫. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৬

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) দেখিয়েছেন যে, শবরপা ছিলেন লুইপার গুরু এবং কিছুটা পূর্ববর্তী।[২৬] তাঁর মতে, 'তাই শবরকেই প্রথম রচয়িতা মনে করা যেতে পারে।'[২৭] তারানাথও লুইপাকে শবরপার শিষ্য বলেছেন।[২৮]

চর্যার পুথিতে সর্বাধিক কবিতা রচনা করেছেন কাহ্নপাদ। তিনি কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণপাদ ও কৃষ্ণবজ্র ইত্যাদি নানান নামে পরিচিত। তাঁর রচিত মোট পদ ১৩টি। তবে চর্যায় পাওয়া গিয়েছে ১২টি, ২৪ নম্বর পদটি পাওয়া যায়নি।[২৯] ধারণা করা হয়, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওড়িশার কোনো এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। শৌরসেনী অপভ্রংশ ও মাগধী অপভ্রংশজাত বাংলায় তিনি পদ রচনা করতেন।[৩০]

রচনার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন ভুসুকুপাদ। চর্যার পুথিতে তাঁর আটটি গান রয়েছে।[৩১] তিনি আদিম বাঙালি ছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। অনেকেই তাঁকে ও শান্তিপাদকে অভিন্ন মনে করেন।[৩২] এরপর তৃতীয় নম্বরে আছেন সরহপাদ, যিনি লিছেন চারটি। বাকিরা কেউ একটি, দুটি বা তিনটি করে লিখেছেন। ২১ নং চর্যার টীকায় চারটি চরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যার সাথে সম্পৃক্ত হলেন মীননাথ। শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, মীননাথ হলেন প্রোটো বাংলা ভাষার প্রথম কবি,

---

২৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১

২৭. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ১৩

২৮. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ৭

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৫-৮৬

৩১. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ১৮

৩২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৯

যাঁর অপর নাম মৎসেন্দ্রনাথ।[৩৩] তবে চর্যার কবিদের পরিচয় নিয়ে যা-ই বলা হয়, এগুলো 'নিছক অনুমান মাত্র'। 'উপযুক্ত তথ্যাদির অভাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন।'[৩৪]

চর্যার কবিদের কাল্পনিক জন্মসাল[৩৫] ও লিখিত পদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো[৩৬] :

নাম	কাল্পনিক জন্মসাল (খ্রি.)	পদের সংখ্যা
শবরপা (সবর)	৫৮০-৭৬০/অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিক	২ (২৮, ৫০ নং)
লুইপা (লূয়ীপাদ)	৭৩০-৮১০/৭১০-৮১০	২ (১, ২৯ নং)
বিরূপা (বিরুবাপাদ, বিরুআ)	অষ্টম শতক	১ (৩ নং)

৩৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০

৩৪. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ২৬

৩৫. জন্মসাল দেওয়া হয়েছে ড. শহীদুল্লাহ্ ও সুখময় মুখোপাধ্যায়ের আন্দাজের ভিত্তিতে। দ্র. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড; সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*।

৩৬. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ৪-৫; সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ৬-১৩; মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ১৩

কাহ্নপা (কাহ্নু, কাহ্নু, কাহ্নি, কাহ্নিলা, কাহ্নিল, কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণাচার্যপাদ, কৃষ্ণাচার্যসুন্দর কৃষ্ণবজ্রপাদ ইত্যাদি)	অষ্টম শতক/৮২০-৯০০	১৩ (৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, *৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ নং)
ডোম্বীপা	৭৯০-৮৯০	১ (১৪ নং)
ভুসুকুপা	একাদশ শতকের মধ্যভাগ	৮ (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯ নং)
কুক্কুরীপা	অষ্টম শতক	৩ (২, ২০, ৪৮* নং)
কম্বলাম্বর (কামলি)	অষ্টম শতক	১ (৮ নং)
আর্যদেব (আজদেব)	অষ্টম শতক	১ (৩১ নং)
কঙ্কণ (কঙ্কণপাদ)	অষ্টম-নবম শতক	১ (৪৪ নং)
মহীধর (মহিআ, মহিণ্ডা, মহিত্তা, মহীপা)	দশম শতক/অষ্টম শতক	১ (১৬ নং)
ধামপা (ধম্মপাদ)	অষ্টম শতক	১ (৪৭ নং)
ভাদ্রপা (ভাদেপা)	দশম শতক/অষ্টম শতক	১ (৩৫ নং)

শান্তিপা (শান্তি)	একাদশ শতক	২ (১৫, ২৬ নং)
বাণীপা	নবম শতক	১ (১৭ নং)
দারিকপা (দারকপা)	নবম শতাব্দী/ একাদশ শতক	১ (৩৪ নং)
সরহপা/পাদ	একাদশ শতক/ অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিক	৪ (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ নং)
গুঞ্জরীপা (গুন্ডরীপাদ, গুড্ডরী)	নবম শতাব্দীর শেষ দিক	১ (৪ নং)
চাটিলপা (চাটিল্ল)	-	১ (৫ নং)
জয়নন্দী (জঅনন্দি, জয়নন্দিপাদ)	-	১ (৪৬ নং)
ঢেণ্ঢণপাদ/পা	-	১ (৩৩ নং)
তন্ত্রীপা (তান্তি)	নবম শতাব্দীর শেষ দিক	১ (২৫* নং)
তাড়ক	-	১ (৩৭ নং)
লাড়ীডোম্বী	-	উল্লেখ নেই

জন্মসালের বিষয়টি নিতান্তই আন্দাজ কিংবা কিচ্ছা-কাহিনির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এগুলো শতভাগ সত্য নয়। কারণ, 'এ বিষয়ে একমাত্র বাহ্যপ্রমাণ কতকগুলি জনশ্রুতি ও বৌদ্ধ ঐতিহ্য। তিব্বতি বৌদ্ধ ঐতিহ্যে ও অন্যান্য সহজিয়া

ঐতিহ্যে যে সব সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কবিদের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করা যায়। কিন্তু এই ঐতিহ্য ও জনশ্রুতির ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত শিথিল হওয়ায় এবিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।'[৩৭] কাজেই, এই জন্মসালগুলোকে ধ্রুব সত্য মনে করার কারণ নেই। বরং তা অনুমাননির্ভর ও আপত্তিযোগ্য বলেই মনে হয়। আমরা দেখাব যে, আপত্তি করার মতো যথেষ্ট কারণ চর্যার বিশেষজ্ঞরা নিজেরাই তৈরি করে দিয়েছেন।

চর্যা নিয়ে বিদেশি ভাষায় চর্চা

চর্যা নিয়ে বিস্তর কাজ হয়েছে, হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও হবে হয়তো। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬) ও ড. সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২) অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন চর্যার পাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের (১৯১১-১৯৬৪) মাধ্যমে চর্যাপদের দার্শনিক পটভূমি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) ও ড. নীহাররঞ্জন রায়ের (১৯০৩-১৯৮১) মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি চর্যার সমকালীন যুগের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে।[৩৮]

চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটান মূলত বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২), তাঁর *History of Bengali Language* (১৯২০) গ্রন্থে। সেখানে তিনি শাস্ত্রীর দাবিকে সম্পূর্ণ

---

৩৭. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ২২

৩৮. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, ভূমিকা

নাকচ করে দেন।[৩৯] বিদেশি ভাষায় চর্যাগানের প্রথম অনুবাদ করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি ডি.ফিল ডিগ্রির জন্য চর্যা নিয়ে গবেষণা করেন ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর থিসিসটি *Les chants mystiques de Kāṇha et de Saraha* (১৯২৮) নামে মুদ্রিত হয়।[৪০] চর্যাপদের তিব্বতি সংস্করণ থেকে অনুবাদ ও পাঠ তৈরি করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী।[৪১] বাগচীর কাজটি *Materials for a Critical Edition of the Old Benagli Charyapadas* (১৯৩৮) নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের *Journal of the Department of Letters*-এ প্রকাশিত হয়।[৪২] পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নও চর্যাপদ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করেন। তাঁর এইসব গবেষণার কিছু অংশ ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়ে *Journal Asiatic*-এর ১৯৩৪ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৪৩] ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের *Obscure Religious Cults and Background of Bengali Literature*। সেখানে তিনি চর্যাপদের

---

৩৯. Bijaychnadra Mazumdar, *History of Bengali Language*, p. 242

৪০. M. Shahidullah, *Les chants mystiques de Kāṇha et de Saraha* (France: Adrien-Maisonneuve 5, Rue de Tournon, 5 PARIS VI), এটির ইংরেজি সংস্করণ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *Buddhist Mystic Songs* (১৯৪০) নামে। এর একটি সংস্করণ ঢাকার মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। দ্র.: M. Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs* (Dhaka: Mawla Brothers, 1960)

৪১. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, *নব চর্যাপদ*, পৃ. ৬

৪২. বাগচীর প্রবন্ধের আরও একটি সংস্করণ পাওয়া যায় *Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Charyapadas: A Comparative Study of the Text and the Tibetan Translation* নামে। এটি বিশ্বভারতী থেকে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৪৩. অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, পৃ. ১৭

অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন।[৪৪] ১৯৪৭ সালে *Indian Linguistics* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সুকুমার সেনের *Index Verborum of the Old Bengali Carya Songs and Fragments* প্রবন্ধটি।[৪৫] সেন ১৯৪৮ সালে *Old Bengali Texts or Carya-Gitikoşa* শিরোনামে চর্যাগীতির টীকা-সহ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।[৪৬] তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের (১৯২৮-১৯৯০) সম্পাদনায় *The Old Bengali Language and Text* প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে।[৪৭] চর্যার ভাষা ও পাঠ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন সেখানে।[৪৮] ড. অতীন্দ্র মজুমদার (১৯২৪-১৯৯৩) চর্যাপদের অনুবাদ প্রকাশ করেন *The Caryāpadas: A Treatise on the Earliest Bengali Songs* শিরোনামে, ১৯৬৭ সালে।[৪৯] ড. নীলরতন সেন (১৯২৫-২০০০) সিমলার ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ থেকে *Caryāgītikoşa (Fascimile Edition)* পুথিচিত্র ও ইংরেজি অনুবাদ-সহ প্রকাশ করেন ১৯৭৭ সালে।[৫০] বাংলাদেশ থেকে হাসনা জসীমউদ্‌দীন মওদুদ (১৯৮০-১৯৯৯) *A Thousand Year Old Bengali Mystic Poetry* নামে একটি

---

৪৪. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *নব চর্যাপদ*, পৃ. ৫

৪৫. Sukumar Sen, *Index Verborum of the Old Bengali Carya Songs and Fragments*, Vol. IX (Calcutta: 1947)

৪৬. *Old Bengali Texts or Carya-Gitikoşa*, Ed. by Sukumar Sen *Indian Linguistics*, Vol, X, (Calcutta, 1948)

৪৭. *The Old Bengali Language and Text*, Ed. by Tarapada Mukherjee. (Calcutta : Calcutta University, 1963)

৪৮. অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, পৃ. ১৮

৪৯. Atindra Mojumder, *The Caryāpadas: A treatise on the earliest Bengali songs* (Naya Prokash, January 1, 1967)

৫০. Nilratan Sen, *Caryāgītikoşa: Fascimile Edition* (Simla: Indian Institute of advanced Study, 1977)

অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৯২ সালে।[৫১]

বাংলাভাষী ছাড়া অনেক ফিরিঙ্গি গবেষকও চর্যা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Per Kvaerne। ১৯৭৭ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *An Anthology of Buddhist Tantric Songs: A Study of the Caryagiti* শিরোনামে।[৫২] এ ছাড়া Dr. Thomas Francis Cleary চর্যাপদের অনুবাদ করেন। সেটি ১৯৯৮ সালে *The Ecstasy of Enlightenment: Teaching of Natural Tantra* শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[৫৩]

---

৫১. মোহাম্মদ মাহফুজুর রশীদ, অনূদিত চর্যাপদ: পাঠভেদ সমস্যা ও 'সন্ধ্যা' ভাষাতত্ত্ব দীপায়ন, পৃ. ১৭

৫২. *An Anthology of Buddhist Tantric Songs: A Study of the Caryagiti*, Ed. by Per Kvaerne, (Oslo : Det Norske Videnskaps Akademi, Universitet forlaget, 1977)

৫৩. Thomas Francis Cleary, *The Ecstasy of Enlightenment: Teaching of Natural Tantra* (Red Wheel/Weiser, April 1, 1998)

০২

নামকরণ ও রচনাকাল-বিতর্ক

শাস্ত্রীর বইটা প্রকাশিত হওয়ার পর চারিদিকে হইচই পড়ে যায়। সকলেই আগ্রহ দেখায় তাঁর এই আবিষ্কার নিয়ে। লোকেরা পড়ে দেখতে থাকে পুথির ভাষা। এরপরই শুরু হয় খটকা। শুরু হয় সংশয়। শাস্ত্রীর সাথে বাড়তে থাকে মতবিরোধ। চর্চার নামকরণ, রচনাকাল, ভাষা ইত্যাদি নিয়ে পণ্ডিতরা বিভক্ত হতে থাকেন নানাভাগে। তৈরি হয় নানা মুনির নানা মত। সেই মতবিরোধের কয়েকটি দিক এই অধ্যায়ে আমরা দেখার চেষ্টা করব।

নামকরণ নিয়ে মতবিরোধ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুথিটির নাম দেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'।[৫৪] মনে হতে পারে যে, পুথির মধ্যেই বোধহয় 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটি উল্লিখিত আছে। 'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুথির কোনখানেই নাম হিসাবে তো দূরের কথা, এই পদগুচ্ছ সাধারণভাবেও উল্লিখিত হয় নি। সাধারণত পুথির পুষ্পিকাতে পুথির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু পুষ্পিকার পাতাটি লুপ্ত হওয়ায় সেখান থেকে পুথিনাম উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। ফলে পুথির নামকরণ নিয়ে বিদ্বৎসমাজে

৫৪. 'চর্য্যাচর্য্যাবিনিশ্চয়' বানানটি এভাবে ছিল মূলত। দ্র. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, পৃ. ৪ (ভূমিকা)

নানা প্রশ্ন ওঠে।'[৫৫] তবে শাস্ত্রী যে কাল্পনিকভাবে নামটি দেননি, এমনটাই মনে করেন সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার : "কারণ তা হ'লে তিনি নিশ্চয়ই 'বিনিশ্চয়' শব্দটি আমদানি করতেন না। 'আশ্চর্য চর্যাচয়', 'চর্যাচয়' বা 'চর্যাসমুচ্চয়' প্রভৃতির ভেতর থেকে একটি আখ্যা বেছে নিতেন"। তাই সরকার ধারণা করেন, শাস্ত্রী হয়তো 'নেপালে প্রাপ্ত পুথিটিতে কোথাও এই নামটি পেয়েছিলেন'।[৫৬]

অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করেছেন শাস্ত্রীর সাথে। তাঁদের মতে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটি সঠিক নয়। কেননা সেটি পুথিতে উল্লেখ নেই। কিন্তু পুথিটির সংস্কৃত টীকার শুরুতে 'আশ্চর্যচর্যাচয়'[৫৭] শব্দটি পাওয়া যায়। নেপালি লিপিকার হয়তো ভুল করে 'আশ্চর্যচর্যাচয়'-এর বদলে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' লিখে ফেলেছেন। আর সেই ভুলটিই অনুসরণ করেছেন হরপ্রসাদ। তাই বিধুশেখর শাস্ত্রী মনে করেন (১৯২৮) নামটা হওয়া উচিত 'আশ্চর্যচর্যাচয়'।[৫৮]

তবে এই মতের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, নির্মল দাশ, মুহম্মদ আবদুল হাই-সহ অনেকেই। অধ্যাপক হাই জানান : "স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে—'আশ্চর্য' শব্দটি 'চর্যাচয়' (=চর্যাসমূহ) শব্দের বিশেষণ। সেক্ষেত্রে 'আশ্চর্যচর্যাচয়' শব্দটিকে সংকলনের নাম

---

৫৫. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৩

৫৬. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ২৮-২৯

৫৭. এর অর্থ 'আশ্চর্য চর্যাসমূহের সংকলন'। [মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ৩]

৫৮. V. Bhattacharya, *Is it Caryāścaryaviniścaya or Aścaryacaryācaya: Indian Historical Quarterly*. Vol. VI. 19,30. pp. 169-71, উদ্ধৃত: নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৩

গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয়না।"[৫৯] নির্মল দাশ যুক্তি দেখিয়ে বলেন,

> বিধুশেখর যে 'আশ্চর্য্যচর্যাচয়' পদগুচ্ছকে পুথির নাম হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, সেটি পুথির অন্তর্গত হলেও সেটি পুথিনাম হিসাবে ঐ শ্লোকবাক্যে ব্যবহৃত হয় নি, ব্যবহৃত হয়েছে ঐ শ্লোক-বাক্যের একটি সাধারণ বাক্যাংশ হিসাবে অর্থাৎ আশ্চর্যচর্যাচয় আশ্চর্য চর্যাসমূহ। কাজেই এটি পুথির অন্তর্গত উল্লেখ—এই যুক্তিতে একে পুথিনাম হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।[৬০]

শাস্ত্রীর নামটি গোলেমেলে মনে হওয়ায় ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী পুথির নাম রেখেছিলেন 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'।[৬১] তিনি মনে করেছিলেন—শাস্ত্রী হয়তো চর্যায় ব্যবহৃত 'আশ্চর্যচর্যাচয়' কথাটির ভিত্তিতে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটি নিজে তৈরি করেছিলেন। আর 'কথাটির প্রকৃত পাঠ হরপ্রসাদ ধরতে পারেননি ব'লেই নামবিভ্রাট দেখা দিয়েছে।'[৬২] সুকুমার সেন এই মতকে সমর্থন করেছেন।[৬৩] কিন্তু অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নামটিকে 'আধুনিক পণ্ডিতজনের পরিকল্পিত' বলে বাতিল করে দিয়েছেন।[৬৪] বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন জানিয়ে নির্মল দাশ বলেছেন,

---

৫৯. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ৩

৬০. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৩

৬১. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ২

৬২. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ২৯

৬৩. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ১

৬৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২

> পুথিতে উল্লেখ নেই—এই যুক্তিতে যদি শাস্ত্রীর 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়, তবে সেই একই যুক্তিতে প্রবোধচন্দ্রের প্রস্তাবিত নামটিও প্রশ্নাধীন হয়ে পড়ে, কারণ পুথির কোথাও 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়' পদগুচ্ছটি নাম হিসাবে দূরে থাক সাধারণ বাক্যাংশ হিসাবেও ব্যবহৃত হয় নি। সুতরাং পুথির নাম হিসাবে 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়' পদগুচ্ছটিও গ্রহণযোগ্য নয়।"[৬৫]

এই মতের অনুসারীরা মনে করেন: 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' শব্দটি যে লিপিকরের ভুল—এ কথা 'কেউই প্রমাণ করেননি, অনুমানের সাহায্যে বলেছেন'।[৬৬] এজন্যই বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'—অর্থাৎ নেপালী পুঁথিতে যে নামটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া এক-কথায় পরিত্যাগ করা যায় না। ইহার একটা অর্থও করা যাইতে পারে—

---

৬৫. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৩। সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকারও দাশের কাছাকাছি মতামত প্রদান করেছেন, 'আশ্চর্য' এবং 'চর্যাচর্য' শব্দগুলোকে ইচ্ছামতো মিলিয়ে নিয়ে প্রবোধচন্দ্র পুথিটির যে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নাম করলেন, তার প্রথমাংশে আছে বিভিন্ন শব্দের জোড়কলম এবং শেষাংশে আছে হরপ্রসাদের অনুবৃত্তি। হরপ্রসাদ প্রথমাংশটি যদি ভুল লেখেন, শেষাংশটিও যে তেমনি ভুল লেখেননি তার যেমন কোন যুক্তি নেই, তেমনি প্রথমাংশটিও যে ভুল লিখেছেন তারও কোন প্রমাণ নেই। 'আশ্চর্য' কথাটি হরপ্রসাদেরও অজানা ছিল না, তবু তিনি আখ্যাতে শব্দটি কোথাও প্রয়োগ করেননি, তার কোন প্রয়োজনও ছিল না। কারণ তাঁর আবিষ্কৃত পুথিতে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটিই গ্রন্থের আখ্যা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বিধুশেখরের 'আশ্চর্যচর্যাচয়' এবং প্রবোধচন্দ্রের 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' আখ্যাদু'টি তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা মতো পরিশোধিত ব্যাখ্যা। দ্র.: সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ২৯

৬৬. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ৩; সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ২৯

যে গ্রন্থ আচরণীয় ও অনাচরণীয় তত্ত্বসমূহকে বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া দেয়, তাহাই 'চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়'।" তিনি অবশ্য 'আশ্চর্যচর্যাচয়' নামটিকেও অযৌক্তিক মনে করেননি।[৬৭] ড. শহীদুল্লাহ্‌ও 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর বিকল্প হিসেবে 'আশ্চর্যচর্যাচয়' নামটি উল্লেখ করেছেন।[৬৮] এঁদের কাছাকাছি মত দিয়েছেন সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার। সরকার মনে করেন—'চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়' নামটিকে 'লিপিকর প্রমাদ ব'লে এক কথায় তাকে খারিজ ক'রে দেওয়া যায় না'। কেননা, এই 'নামটি... অর্থহীন শব্দসমষ্টি নয়, এই নামের একটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়'। এরপর তিনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া ব্যাখ্যাটাই উল্লেখ করেছেন।[৬৯]

শাস্ত্রীর ধারণা ছিল, তিনি চর্যাগীতির মূল পুথিই আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু সকল পণ্ডিত একমত যে, শাস্ত্রীর পুথিটি আসলে মূল কপির নকল মাত্র। আর 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটিও মূল গীতির নয়।[৭০] স্বভাবতই এখন প্রশ্ন আসে—তাহলে মূল নাম কী ছিল?

শাস্ত্রীর *বৌদ্ধ গান ও দোহা* (১৯১৬) প্রকাশিত হওয়ার আগেই (১৯১৫) নেপালের রাজদরবার থেকে একটি পুথি-তালিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে দ্বিতীয় খণ্ডের দুই জায়গায় পুথির নাম হিসেবে উল্লেখ করা হয় 'চর্যাচর্য্যটীকা' শব্দটি। শাস্ত্রী নিজেও এই নাম মলাটে লিখিত দেখেছিলেন।[৭১] তিনি চাইলেই

---

৬৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২

৬৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩, ৬৮

৬৯. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ২৮

৭০. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৩; সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ২৯

৭১. মাহবুবুল হক, *চর্যাগীতি পাঠ*, পৃ. ২২১

এটিকে মূল নাম হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। তাহলে কেন সে কাজটি করেননি?

উত্তরটা শাস্ত্রীর কাছ থেকে নিলেই ভালো হতো। কিন্তু তিনি চলে গেছেন পরপারে। তাই এখন 'যুক্তিনির্ভর অনুমান' ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। আর সেই অনুমানের ভিত্তিতে উত্তরটা জানব নির্মল দাশের কাছ থেকে :

> পুথি লেখার সময় মলাটে কোনও নাম লেখা ছিল না, পরে রাজকীয় গ্রন্থাগারে পুথিটি গৃহীত হওয়ার সময় ব্যবহারের সুবিধার জন্য গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী পুথিটির মলাটে একটি সাধারণ পরিচয়-সূচক নাম হিসাবে "চর্যাচর্য্যটীকা" কথাটি লিখে রাখেন। তখন নেপালের শাসনতন্ত্রে বৌদ্ধযুগ শেষ হয়ে হিন্দু যুগ পুরোপুরি শুরু হয়ে গিয়েছে এবং সরকারি কাজকর্মে প্রত্ন-বাংলার বদলে নাগরী হরফের ব্যবহার চালু হয়ে গিয়েছে। এই প্রক্ষেপ সন্দেহেই শাস্ত্রী সম্ভবত এই নামটি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি, এবং পুথির একটি গ্রহণযোগ্য নাম চালু করার জন্য তিনি বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেই একটি নাম তৈরি করেন।[৭২]

তার মানে, 'চর্যাচর্য্যটীকা' নামটিও মূল নাম নয়, 'গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী'র দেওয়া। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ নাম পুথির মলাটেও লিখিত দেখেছেন। কিন্তু তিনি ওই নামে চর্যাগীতির নামকরণ করেননি। কারণ, 'নাগরী হরফে লিখিত হওয়ায় শাস্ত্রী এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন নি'।[৭৩] "তাহ'লে এখন

৭২. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৫

৭৩. মাহবুবুল হক, *চর্যাগীতি পাঠ*, পৃ. ২২১

প্রশ্ন দাঁড়ায়, মূল চর্যাসংকলন-গ্রন্থখানির নাম কী ছিল?"[৭৪]

মূল পুঁথির নাম কী ছিল, তা আসলে জানা যায় না। তিব্বতি অনুবাদটিও শিরোনামহীন। 'তিব্বতী ঐতিহ্যে এই শ্রেণীর গীতিসংকলন চর্যাগীতিকোষ এবং তার টীকা চর্যাগীতিকোষবৃত্তি নামে পরিচিত হ'লেও সটীক সম্পূর্ণাঙ্গ চর্যাসংগ্রহের পুথিটি কি নামে আখ্যাত হতো জানা যায় না।'[৭৫] তাই এখানেও পণ্ডিতগণ আন্দাজের ভিত্তিতেই নামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, চর্যার মূল সংগ্রহের নাম 'চর্যাকোষ' বা 'চর্যাগীতিকোষ'।[৭৬] তাঁদের মতে—'তিব্বতী অনুবাদ ও তেঙ্গুর-তালিকা এই অনুমানের সপক্ষেই সহায়তা করে'।[৭৭] তবে প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাগীতির যে তিব্বতী অনুবাদ সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে মূল সংকলনের নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। তাই নির্মল দাশের সিদ্ধান্ত হলো—'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি নামটিই পুথির প্রকৃত নাম হিসাবে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায়'।[৭৮]

রচনাকাল নিয়ে বিতর্ক

'চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিত-মহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে।'[৭৯] তবে সকলের মতামত সামনে রাখলে বোঝা যায়,

---

৭৪. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ৪

৭৫. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ২৮

৭৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২; নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৫; সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ২৯; মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ৪

৭৭. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ৪

৭৮. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৫

৭৯. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ. ৮

এগুলো চতুর্দশ শতাব্দীর আগে রচিত হয়েছে।[৮০] কিন্তু ঠিক কত আগে?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'এই বাঙ্গালা পদগুলি ৭ শত হইতে ১৩ শতের মধ্যে লেখা হইয়াছিল'।[৮১] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুকুমার সেন, নির্মল দাশ, সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের মতে ১০ম থেকে ১২শ শতাব্দীর (৯৫০-১২০০) মধ্যেই এগুলো রচিত হয়েছে।[৮২] সুখময় মুখোপাধ্যায় '৭৫০ ১০৫০ খৃষ্টাব্দকে চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল বলে গ্রহণ করার' কোনো বাধা আছে বলে মনে করেন না।[৮৩] অপরদিকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই সময়কে আরও কয়েক শত বছর পিছিয়ে নিতে চান।[৮৪] শহীদুল্লাহ্ মনে করেন 'আশ্চর্যচর্যাচয়ে আনুমানিক ৬৫০ হইতে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের ভাষা লিপিবদ্ধ হইয়াছে'।[৮৫]

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[৮৬] ও সুকুমার সেন এই হিসাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন : 'এমন অনুমানের পক্ষে ছিটা-ফোঁটা

---

৮০. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী*, পৃ. ৫-৬

৮১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, পৃ. ৬ (ভূমিকা)

৮২. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ৫-৬; নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৬; সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ২৩

৮৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ১৫

৮৪. আহমদ শরীফ, 'বাংলা সাহিত্যের সূচনা: চর্যাগীতি', আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫০

৮৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩

৮৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬৬-১৬৭

তথ্যও নাই।'[৮৭] তাঁদের সূত্র ধরে বলতে হয়—যাঁরা রচনাকালকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন, তাঁরা 'ছিটা-ফোঁটা তথ্যও' পেশ করতে পারেননি। সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আন্দাজের ওপর ভিত্তি করেই। অবশ্য করারও ছিল না কিছু। বাকিদের সিদ্ধান্তও একই পন্থায় নেওয়া। কারণ, 'চর্যাপদ-রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদের সকলের জীবন ও জীবনী সম্বন্ধে সঠিক তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি।'[৮৮] তাই পণ্ডিতরা আন্দাজের ভিত্তিতেই সাল গণনা করেছেন, যাকে নির্মল দাশ বলেছেন 'অনুমান-সূত্র'।[৮৯]

আসলে ভাষাতাত্ত্বিক অনেক জটিলতার ক্ষেত্রেই আমরা ফিরিঙ্গিদের অনুমানের ওপর নির্ভর করে থাকি। এর উজ্জ্বল নমুনা হলেন পণ্ডিত সুনীতিকুমার। তিনি বাংলা ভাষার সূত্র আবিষ্কার করেছেন গ্রিয়ারসনের অনুমানের ওপর নির্ভর করেই।[৯০] ১৭৮৬ সালে *Asiatic Society of Bengal*-এর প্রেসিডেন্ট[৯১] উইলিয়াম জোনস এক বার্ষিক সভায় বক্তৃতা করেন। সেখানে তিনি ল্যাটিন, গ্রিক, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার শব্দ ও ধাতুরূপ বিশ্লেষণ করে বলেন, এইসব ভাষার মধ্যে ঐক্য আছে। তাঁর ধারণামতে, এইসব ভাষার লোকেরা আদিতে একই জায়গায় ছিল। কালক্রমে তাঁদের বিভাজন হয়েছে। অপরদিকে ১৮৪৪ সালে ভাষাবিদ টমাস ইয়ং আলোচ্য

---

৮৭. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ৫-৬

৮৮. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পৃ. ১৬

৮৯. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৮

৯০. আহমদ শরীফ, 'বাংলা সাহিত্যের সূচনা: চর্যাগীতি', আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, ২৯৭

৯১. *Encyclopedia Britannica*: 'Asiatic Society of Bengal', https://www.britannica.com/topic/Asiatic-Society-of-Bengal

ভাষাগুলোকে *Family of Indo-European* (ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারভুক্ত) বলে অভিহিত করেন। এর পর থেকেই এইসব ভাষাভাষী নিজেদেরকে পরিচয় দেয় ইন্দো-ইউরোপিয়ান বলে। ড. শহীদুল্লাহ্ ও ড. সুনীতিকুমার-সহ অন্যান্য বাঙালি ভাষাবিদ এই সিলসিলাকেই অনুসরণ করেছেন। বাংলার মূল আবিষ্কার করেছেন ফিরিঙ্গিদের অনুমানের পথ ধরেই।[৯২]

এগুলো কিছুটা অপরের দেখাদেখি আন্দাজে ঢিল ছোড়ার মতন, সভ্য ভাষায় যাকে বলে 'অনুমান-সূত্র'! চর্যাপদের বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও 'অনুমান-সূত্র' ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কারণ, 'চর্যা-কবিদের জীবৎকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদি তেমন পাওয়া যায় না, প্রধানত জনশ্রুতি ও কিংবদন্তি থেকেই তাঁদের আবির্ভাবকালের আভাস পাওয়া যায়। এই আভাস প্রধানত অনুমান-নির্ভর হওয়ায় চর্যার রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের অভিমতও বিবিধ।'[৯৩] তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে 'দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বাঙলার আদিকবিরা আদি বাঙলা ভাষায় রচনা করেছিলেন এ-রহস্যময় আদিম সৌন্দর্যময় কবিতাগুচ্ছ।'[৯৪]

অবশ্য দ্বাদশ শতকের পরেও রচিত হয়েছিল চর্যাগীতি।[৯৫] ব্রাহ্মণদের চোখের আড়ালে গোপনে গোপনে বৌদ্ধরা লিখেছিল অনেক কবিতা। ১৯২০ সাল থেকে পরবর্তী এক দশক ধরে

---

৯২. মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, পৃ. ৫৮-৫৯

৯৩. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৬

৯৪. হুমায়ুন আজাদ, *কতো নদী সরোবর*, পৃ. ২৪

৯৫. আনিসুজ্জামান, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যান্য নিদর্শন', *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮

রাহুল সাংকৃত্যায়ন কয়েকবার তিব্বত সফর করেন। সেখান থেকে তিনি ২০টি চর্যাগীতি সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। ১৯৫৪ সালে সেগুলো প্রকাশিত হয় এলাহাবাদ থেকে। ১৯৩৮ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতি ভাষায় চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। সেগুলো প্রকাশিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জার্নালে।[৯৬] ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত নেপাল যান। সরলানন্দ বজ্রাচার্য ও অন্যদের সহযোগিতায় তিনি ২৫০টি পদ সংগ্রহ করেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে চর্যাপদগুলো ১৯৮৯ সালে অধ্যাপক অসিতকুমারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।[৯৭] ১৯৭৭ সালে নীলরতন সেন নেপালের রাজদরবার থেকে মূল নিদর্শনের আলোকচিত্র ধারণ করেন, যার সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয় *Caryāgītikoṣa (Fascimile Edition)* শিরোনামে।[৯৮] ২০১৮ সালে অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ *নতুন চর্যাপদ* নামে ৩৩৫টি পদের একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন ঢাকা থেকে।[৯৯]

শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুথিটির হালচাল

নেপালে শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুথিটি খুব বেশি প্রাচীন নয়। তবে যিনি টীকা লিখেছেন, তাঁর সময়কাল সম্পর্কে আন্দাজে কিছু

---

৯৬. মামুন অর রশীদ, চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার ও গান সংগ্রহের ধারাক্রম, *প্রথম আলো*, প্রকাশ : ১২ এপ্রিল ২০১৯

৯৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১০

৯৮. Nilratan Sen, *Caryāgītikoṣa: Fascimile Edition* (Simla: Indian Institute of advanced Study, 1977)

৯৯. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *নতুন চর্যাপদ*, পৃ. ৫-৬ (ভূমিকা)

বলা যায়। টীকা-লেখকের নাম মুনিদত্ত।[১০০] পণ্ডিতদের ধারণা তিনি 'চতুর্দশ শতকের ব্যক্তি'।[১০১] বোঝাই যাচ্ছে, পুথির সংকলনটি প্রাচীনকালে তৈরি নয়। তবে শাস্ত্রীর মত ছিল ভিন্ন। তিনি মনে করতেন কবিতা ও সংকলন দুটোই ১২ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে। এমনকি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর অক্ষরগুলোর কাল বিচার করে তিনি বলেছিলেন, 'এ পুঁথির অক্ষরগুলি ১২ শতকের গোড়ার।'[১০২]

কিন্তু 'হরপ্রসাদের অন্য অনেক সিদ্ধান্তের মত পুঁথির লিপিকালের সিদ্ধান্তও পরবর্তী সময়ে সমর্থিত হয়নি'। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুথিটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর লিপিকাল অপেক্ষাও আধুনিক'। সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার বলেন,

> পুঁথিটি যতোই কাগজের মত মসৃণ পাকান তালপাতায় লেখা হোক না কেন, এর লিপিকাল কোন ক্রমেই মুসলমান আমলের আগে নয়। মুনিদত্তের টীকা রচনার কাল আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী ব'লে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। প্রাপ্ত পুঁথির লিপিকাল তার পরে ধ'রে অনেকে একটি বিরাট সময়সীমা নির্দেশ ক'রে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে এর লিপিকালকে ফেলতে চেয়েছেন।[১০৩]

শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুঁথিটির লিপি তৈরি করা হয়েছে মুসলিমরা

---

১০০ [illegible], চর্যাপদ, পৃ. ২২

১০১ [illegible] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন পর্ব), পৃ. ৪২; নির্মল দাশ, চর্যাগীতি পরিক্রমা, পৃ. ১১

১০২ হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, পৃ. ২২; উদ্ধৃত: সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, [illegible], পৃ. ২৪

১০৩ সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, [illegible], পৃ. ২৩-২৫

আসার পরে। এর পক্ষে শক্ত দলিল পাওয়া যায় প্রাপ্ত পুথি থেকেই। পুথির প্রথম পাতায় নাগরী হরফে একটি তারিখ লেখা আছে: 'সম্বত ৭৪১ ভাদ ষমবাত = ভাদ্র ৭৪১ সংবৎ। নেওয়ার সংবতের সূচনা ২০ অক্টোবর ৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে, বর্ষারম্ভ কার্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদ থেকে... সেই হিসাবে ভাদ্র নেওয়ার সংবতের একাদশ মাস; কাজেই ৭৪১ সংবৎ+৮৭৯ = ১৬২০ খ্রীস্টাব্দ। হয়ত ঐ বৎসর ভাদ্র মাসে পুথিটি রাজ-গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়েছিল।'[১০৪] এই জন্য নির্মল দাশ মনে করেন, 'পুথিটি ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে বা চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে লিখিত হয়েছিল।'[১০৫]

চর্যা মূলত একটা সংকলিত পুথি। আর শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুথিটি সংকলন করা হয়েছিল বাংলায় মুসলিম-বিজয়ের পরে। 'কোন ক্রমেই মুসলমান আমলের আগে নয়'। এটির লিপিকাল হতে পারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন[১০৬]-যুগের বা তারও পরের।

কাজেই লিপিকাল সম্পর্কে শাস্ত্রীর অনুমান আগাগোড়াই ভুল। বরং বলা যায়, চর্যার গীতগুলো সংকলিত হয়েছে মধ্যযুগে (১২০০-১৮০০)। আরও নির্দিষ্ট করে বললে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে।[১০৭] একে জোর করে প্রাচীন যুগে (৬৫০-১২০০) নেওয়ার দরকার নেই আসলে।

---

১০৪. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১১

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১০৬ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণীত না হলেও প্রাকচৈতন্য যুগের (খ্রিস্টীয় ১৪শ শতক) মনে করা হয়। (*বাংলাপিডিয়া*: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, https://bn.banglapedia.org/index.php?title=শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

১০৭ সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৩৭

গানগুলোর প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহ

শুধু চর্যার কপিকৃত পুথির সাল নিয়েই যে সন্দেহ, তা কিন্তু নয়। পুথির গানগুলোও আসলে সব প্রাচীন যুগের নয়। হ্যাঁ, কিছু কিছু গান হয়তো প্রাচীন যুগের। তবে সবগুলো নয়। কাহ্নের 'একটি চর্যায় (১২) নয়বল অর্থাৎ দাবা খেলার প্রসঙ্গ আছে। এ খেলায় রাজাকে বলা হয়েছে "ঠাকুর"।'[১০৮] সেই কবিতাটি হলো :

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅ বল
সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসিরে ঠাকুর
তআরি উএস কাহ্নু ণিঅড় জিনউর॥
পহলেঁ তোড়িআ বড়িআ মরাড়িইউ
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘোলিউ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা
অবশ করিআ ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্নু আহ্মে ভলি দাহ দেহুঁ
চউষঠঠি কোঠা গুণিয়া লেহুঁ॥[১০৯]

চর্যাপদের এই কবিতায় আমরা 'ঠাকুর' শব্দটি পাচ্ছি, যার ব্যাপারে সুকুমার সেন বলেছেন—'শব্দটি বিদেশী, তুর্কী।'[১১০] তুর্কি ভাষায় মূল শব্দটি ছিল 'তিগির/তাগরি'। সেখান থেকে

---

১০৮. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ২৬

১০৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, পৃ. ২২

১১০. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ২৬; আরও দেখুন: আনিসুজ্জামান, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যান্য নিদর্শন', *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭১

সংস্কৃত ও প্রাকৃতে এটি 'ঠক্কুর' রূপ ধারণ করে। আর বাংলায় এসে তা হয়ে যায় 'ঠাকুর'।[১১১]

তুর্কি জাতির সাথে বাংলা অঞ্চলের পরিচয় ঘটে তেরো শতকের গোড়ার দিকে। মুসলিম বিজেতা বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে বাংলায় তাঁদের আগমন ঘটে। তবে তেরো শতকের ঠিক কোন সালে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। 'কুৎবুদ্দীনের সভাসদ হাসান নিজামীর *তাজ-উল-মাসির* গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কুৎবুদ্দীন কালিঞ্জর দুর্গ জয় করেন, এবং কালিঞ্জর হইতে তিনি সরাসরি বদায়ুনে চলিয়া আসেন; তাঁহার বদায়ুনে আগমনের পরেই "ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার উদন্দ্-বিহার (অর্থাৎ ওদন্তপুরী বিহার) হইতে তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন" এবং তাঁহাকে কুড়িটি হাতী, নানারকমের রত্ন ও বহু অর্থ উপঢৌকন স্বরূপ দিলেন। সুতরাং বখতিয়ার ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের পরের বৎসর অর্থাৎ ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণা করাই সঙ্গত।'[১১২] অবশ্য মুসলিমদের হাতে পরাজিত হয়ে লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে যান পূর্ববাংলার বিক্রমপুরে। তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা বেশ কিছুকাল সেখানে রাজত্ব করেন। তাদেরকে হটিয়ে পুরো বাংলা আয়ত্তে আনতে তুর্কি মুসলিমদের আরও সময় লেগে যায়।[১১৩]

এই পর্যায়ে এসে একটা প্রশ্ন আপনা-আপনিই উদ্ভূত হয়—তুর্কিরা বাংলা অঞ্চলে এলেন ত্রয়োদশ শতকে। তাঁদের আসার

---

১১১ [illegible] (সম্পাদিত), ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৫০৮

১১২ রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), বাংলা দেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১-২

১১৩ [illegible], বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা প্রসঙ্গ- ঔপনিবেশিক পর্ব, পৃ. ১৫২

পূর্বেই দ্বাদশ শতক বা তারও আগেকার কবিরা তুর্কি শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন কীভাবে? আর যদি তুর্কিরা আসার পরেই তাঁরা অবহিত হয়ে থাকেন, তবে চর্যাপদ প্রাচীন নিদর্শন হলো কীভাবে? এটা তো মধ্যযুগের (১২০০-১৮০০) রচনা হওয়ার কথা!

চর্যার সব কাব্যকে যতটা প্রাচীন বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, সেটা আসলে কথার-কথা ছাড়া কিছুই না। হ্যাঁ, হতে পারে তার কিছু কিছু কবিতা প্রাচীন। কিন্তু সবগুলোই যে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছে, এই দাবির আসলে আন্দাজ-অনুমান ছাড়া শক্ত কোনো ভিত্তি নেই। স্পষ্টতই বোঝা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীর পরেও রচিত হয়েছে চর্যাগীতি।[১১৪] এই ধারা চলমান থেকেছে চতুর্দশ শতাব্দী[১১৫] ও এর পর পর্যন্ত। কাজেই, সবগুলো চর্যাকে খুব বেশি প্রাচীন মনে করে উচ্ছ্বসিত হওয়ার রাস্তা বোধহয় বন্ধই রাখতে হবে আমাদেরকে। সত্যিটা মেনে নিয়ে স্বীকার করতে হবে যে, সবগুলো রচনা আসলে ততটা প্রাচীন নয়।

---

১১৪. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *নব চর্যাপদ*, পৃ. ৯৯; আনিসুজ্জামান, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যান্য নিদর্শন', *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮

১১৫. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ৫-৬

০৩

চর্যার ভাষা-বিতর্ক

আবিষ্কার তো হলো। গবেষণাও হলো। কিন্তু সমস্যা আরও গাঢ় হলো এখানেই। চর্যার ভাষা কী? কোন ভাষায় লেখা হয়েছে এই পুথিগুলো? এগুলো কি আদৌ বাংলা? খোদ আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যার ভাষাকে বললেন 'সন্ধ্যা ভাষা', বা 'আলো-আঁধারি ভাষা'—'কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, বুঝা যায় না।'[১১৬]

'সন্ধ্যা' নাকি 'সন্ধা'

চর্যার ভাষাকে কি 'সন্ধ্যা' বলা হবে নাকি 'সন্ধা' এই নিয়েও বেশ তর্ক রয়েছে বিদ্বানদের মধ্যে। মহাযান শাস্ত্র-মতে 'সন্ধ্যা' বানান লেখা হলেও বিধুশেখর শাস্ত্রী মনে করেন এটি ভুল। তিনি সমু 'ধ্যৈ' ধাতুর পরিবর্তে 'সম-ধা' থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন বলে মনে করেন। তাঁর মতে শব্দটি 'সন্ধ্যা' নয় 'সন্ধা'।[১১৭] প্রবোধচন্দ্র বাগচীও এই মতের অনুসারী। কিন্তু শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন—প্রাচীন তান্ত্রিক কেতাবে 'সন্ধ্যা' এবং 'সন্ধা' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুকুমার সেনও সন্ধ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে

---

১১৬. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, পৃ. ৮

১১৭. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ৬৪

শাস্ত্রীর সাথে দ্বিমত করেছেন। সেন বলেন,

> সন্ধ্যা ভাষায় মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।' একথা ঠিক নয়। সন্ধ্যা (বা সন্ধা) ভাষার কোন সম্পর্ক নাই দিবারাত্রির মোহানার সঙ্গে।... যে ভাষায় বা শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয় অথবা যে ভাষায় শব্দের অর্থ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, তাহাই সন্ধ্যা (সন্ধা) ভাষা।[১১৮]

সেনের কাছাকাছি মত দিয়েছে অধ্যাপক ড. পরীক্ষিত হাজরিকা। তিনি অসমিয়া ভাষায় লেখা *চর্য্যাপদ* গ্রন্থে বলেন,

> সন্ধ্যা-ভাষাৰ তাৎপর্য্য হ'ল-ইয়াৰ অন্তৰালত এটা অভীষ্ট অর্থ থাকে...অর্থাৎ সন্ধ্যা-ভাষা হ'ল দুটা অর্থযুক্ত ভাষা। পশ্চিমীয়া পণ্ডিত সকলে সন্ধ্যা-ভাষাক প্রহেলিকাময় ভাষা বুলি গ্রহণ কৰিছে।[১১৯]

ড. হাজরিকা এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ভিন্ন ধর্মের লোকেরা যাতে সহযানী লোকদের ধর্মতত্ত্ব বুঝতে না পারে, সে জন্যে চর্যার কবিরা এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন।[১২০]

সন্ধ্যাভাষা সম্পর্কে পৃথক একটি মত দিয়েছেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। চর্যাপদ প্রকাশের ৮ বছর পর (১৯২৪) বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সন্ধ্যা বলতে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে

১১৮ সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ২৪

১১৯. পরীক্ষিত হাজরিকা, *চর্য্যাপদ*, পৃ. ২২

১২০. প্রাগুক্ত

বোঝায়। তাঁর মতে, এটি বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল ও সাঁওতাল পরগনা নিয়ে গঠিত দক্ষিণ-পূর্ব ভাগলপুরের আদি নাম।[১২১] বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন যে, এ-অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষার নাম ছিল 'সন্ধ্যাভাষা'। যদিও এই দাবি পণ্ডিতদের কাছে হালে পানি পায়নি।[১২২]

'সন্ধ্যা' বা 'সন্ধা' নিয়ে বিতর্ক যতই থাকুক, চর্যাপদের ভাষা যে আসলেই দুর্বোধ্য—এটা শতভাগ সত্য। বিদ্বানগণ একে বলেছেন 'প্রচ্ছন্নভাষ', 'প্রচ্ছন্ন উক্তি', 'প্রহেলিকাময়', 'রহস্য', 'অভিসন্ধার', 'হেঁয়ালি', 'অভিপ্রায়িক ও নেয়ার্থ বচন', 'enigmatique language' ইত্যাদি।[১২৩] চর্যার টীকা-লেখক মুনিদত্ত নিজেও এই ভাষাকে বলেছেন রূপক বা প্রতীকী।[১২৪] আসলেই এর মর্ম উদ্ধার করা বেশ দুরূহ। দু-একটা লাইন পড়লে সে কথার বাস্তবতা বোধহয় স্পষ্ট হবে:

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।

---

১২১. Rabindranath Tagore (Ed.), *Visvabharati Quarterly*, p. 26

১২২. মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ, অনূদিত চর্যাপদ : পাঠভেদ সমস্যা ও 'সন্ধ্যা' ভাষাকে দীপায়ন, পৃ. ১৮

১২৩. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, চর্যাপদের ভাষা-বিতর্ক: একটি পর্যালোচনা, পৃ. ১০; মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ, অনূদিত চর্যাপদ : পাঠভেদ সমস্যা ও 'সন্ধ্যা' ভাষাকে দীপায়ন, পৃ. ১৮

১২৪. সৈয়দ আলী আহসান, *চর্যাগীতি-প্রসঙ্গ*, পৃ. ৬১

সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি আই॥
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লাহুরে পাস॥
ভণই লুই আম্হে সাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পণ্ডি বইঠা॥[১২৫]

চর্যাগীতির 'পদগুলি হেঁয়ালীর ধরণে লেখা, বাহিরের অর্থ ধরা গেলেও ভিতরের আধ্যাত্মিক অর্থ বোঝা খুবই কঠিন।'[১২৬] 'এ পুঁথির বাঙলা বাঙালী আজ বুঝিতে পারে না।'[১২৭] এমনকি চর্যার সমসাময়িক আম-লোকেরাও হয়তো বুঝতে পারেননি কিছু। পারেননি বলেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, টীকা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয়েছে। অনেক পণ্ডিতও হিমশিম খেয়েছেন চর্যার মর্ম উদ্ধার করতে গিয়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তো রণে ভঙ্গ দিয়ে বলেছেন : 'যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই।'[১২৮]

চর্যাগীতি বুঝতে গিয়ে অনেকেই খেই হারিয়ে ফেলেছেন। অনেকেই আবার আসল মর্ম উদ্ধারে ভুল করেছেন। এই ধরনের বেশ কিছু উদাহরণ একত্র করেছেন মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ তাঁর "অনূদিত চর্যাপদ : পাঠভেদ সমস্যা ও 'সন্ধ্যা' ভাষাকে দীপায়ন" নামক প্রবন্ধে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে

---

১২৫. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, পৃ. ১৫। আধুনিক বাংলায় এই কবিতার কাব্যিক অনুবাদ করেছেন দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ। দ্র. *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস*, পৃ. ১৭

১২৬. দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস*, পৃ. ১২

১২৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গপরিচয়*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫

১২৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, পৃ. ৮

পদে পদে পণ্ডিতরা মতভেদ করেছেন শব্দের অর্থ ও বাক্যের মর্ম নির্ধারণ করতে গিয়ে। রশীদের উদাহরণ থেকে দেখা যায়, প্রায় ক্ষেত্রেই মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছেন বিদ্বানরা।

উদাহরণ হিসেবে চর্যার 'কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ'[১২৯] লাইনটির কথা বলা যায়। ড. শহীদুল্লাহ্ এর অনুবাদ করেছেন: 'নেকড়া চোরে নিল, কি গিয়া মাগে'। কিন্তু অন্যরা একে সঠিক মনে করেননি। কারণ, পরিস্থিতি বলছে—'কানেট তো চুরি হয়ে গেল, তা কার কাছ (বা কোথা) থেকে চেয়ে আনবে'। ফলে, নীলরতন সেন এর অনুবাদ করেছেন: 'কর্ণাভরণ চোরে নিল, কার কাছে গিয়ে মাগছ'। নির্মল দাশ একে প্রশ্নবোধক বাক্য হিসেবে গণ্য করেছেন: 'চোরে কানেট নিলে কার কাছে গিয়ে সন্ধান করা যায় (বা চাওয়া যায়)?' শহীদুল্লাহ্ এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন: 'where shall she go to beg?'। এই বাক্য পার ক্বের্ন অনুবাদ করেছেন অন্যভাবে—'where shall one go to search for it?'। হাসনার অনুবাদ আরও ভিন্ন—'Where can we find the kanet'। আবার সবার থেকে আলাদা অনুবাদ করেছেন নীলরতন সেন—The thief has taken away the ear-ring, going where can it asked for।[১৩০]

এই ধরনের শত শত মতবিরোধ রয়েছে পণ্ডিতদের মধ্যে। যা থেকে প্রমাণ হয় যে, চর্যার বিভিন্ন কবির লেখনী ও দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে একমত নন তাঁরা। একেকজন পাঠের মর্ম উদ্ধার করেছেন একেকভাবে। অনেকেই আবার মর্ম উদ্ধার করতে

---

১২৯. ২নং চর্যার তৃতীয় দোহার দ্বিতীয় চরণ।

১৩০. মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ, অনূদিত চর্যাপদ: পাঠভেদ সমস্যা ও সন্ধ্যা ভাষাকে দীপায়ন, পৃ. ২৭

গিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেছেন, সংশয়ে জড়িয়েছেন, এমনকি খেই-ও হারিয়ে ফেলেছেন।

চর্যায় ছিল না বাংলার বর্তমান হরফ

চর্যা মূলত একটা সংকলিত পুথি। আন্দাজের ভিত্তিতে বলা হয়, এগুলো সংকলন করা হয়েছিল চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে।[১৩১] এই পুথির সাথে জড়িয়ে আছে নানান প্রশ্ন। 'সাধারণতঃ পুথির আদিতে ও অন্তে গ্রন্থের নাম লিখিত থাকে। কিন্তু চর্যার পুথি আদ্যন্ত খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়, কাজেই গ্রন্থের নাম জানা যায় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় এই সঙ্গে চর্যাপদের একটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত টীকাও পাইয়াছিলেন। টীকায় টীকাকারের নাম পাওয়া যায় নাই, পরে জানা গিয়াছে টীকাকার চতুর্দশ শতকের ব্যক্তি, নাম—মুনিদত্ত।'[১৩২]

অবাক-করা বিষয় হলো, সংকলক 'মুনিদত্ত ৫০টি চর্যার বিশদ টীকা তৈরি করলেও এর ভাষা সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দেননি'।[১৩৩] আবিষ্কারের পরে দেখা গেল, সংকলনটি বাংলা হরফে লিপিবদ্ধ নয়। তালপাতায় লেখা[১৩৪] যে পুথিটি শাস্ত্রী উদ্ধার করে আনলেন, সেটার সাথে বর্তমান বাংলা হরফের কোনো মিল নেই।[১৩৫] বরং 'লিপির ঢং অনেক ক্ষেত্রেই দেবনাগরী অক্ষরের মতো। ভাষার দিক দিয়ে কয়েকটি চর্যায় পরবর্তীকালের ব্রজবুলির বিশেষত্ব

---

১৩১. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৩৭

১৩২. তারাপদ ভট্টাচার্য, *বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন পর্ব)*, পৃ. ৪২

১৩৩. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, চর্যাপদের ভাষা-বিতর্ক: একটি পর্যালোচনা, পৃ. ১২

১৩৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, পৃ. ৯

১৩৫. শামসুল আলম সাদিদ, *চর্যাপদ : তাত্ত্বিক সমীক্ষা*, পৃ. ১৫

দেখতে পাওয়া যায়।'[১৩৬] অপরদিকে পুথির প্রথম পাতায় যে তারিখটা লেখা ছিল, সেটা ছিল নাগরী হরফের। শিরোনামটিও নাগরীতেই লেখা—'চর্য্যাচর্য্যটীকা'।[১৩৭] এর টীকাগুলো লেখা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়।[১৩৮]

নেপালে একসময় বৌদ্ধ রাজারা শাসন করত। কিন্তু তাদেরকে হটিয়ে 'যখন বহিরাগত হিন্দু রাজবংশের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হয় তখন থেকেই (মোটামুটি পঞ্চদশ শতকের দিকে) হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির স্মারক হিসাবে নেপালে প্রত্ন-বাংলা হরফের বদলে নাগরী হরফ রাজকীয় লিপি হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং সর্ববিধ রাজকীয় কাজকর্মে নাগরী লিপি ব্যবহৃত হতে থাকে'।[১৩৯] সেজন্য চর্যাতে নাগরীর প্রভাব স্পষ্ট। শাস্ত্রীর *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা* (১৯১৬) প্রকাশিত হওয়ার আগের বছর নেপালের দরবার থেকে একটি পুথি-তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। 'ঐ তালিকার দ্বিতীয় খণ্ডের দু জায়গায় "চর্যাচর্য্যটীকা" কথাটি পুথির নাম হিসেবে উল্লেখিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ নাম পুথির মলাটেও লিখিত দেখেছেন।' কিন্তু তিনি ওই নামে পুথিগুলোর নামকরণ করেননি। কারণ, 'নাগরী হরফে লিখিত হওয়ায় শাস্ত্রী এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন নি।'[১৪০]

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—গোটা পুথিটি তাহলে কোন

---

১৩৬. অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, পৃ. ১৫

১৩৭. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১১

১৩৮. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৬২; তারাপদ ভট্টাচার্য, *বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন পর্ব)*, পৃ. ৪২

১৩৯. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৪

১৪০. মাহবুবুল হক, *চর্যাগীতি পাঠ*, পৃ. ২২১

হরফে লেখা ছিল? সেটা বাংলা বর্ণ ছিল না। নির্মল অবশ্য চর্যার লিপিকে 'প্রত্ন-বাংলা' হরফ বলতে চেয়েছেন।[১৫১] কিন্তু এই আসলে সঠিক মন্তব্য নয়। কারণ চর্যাগীতিগুলো বঙ্গলিপিতে লেখা ছিল না।[১৫২] বরং তার 'লিপির ঢং অনেক ক্ষেত্রেই দেবনাগরী অক্ষরের মতো'।[১৫৩] তাই পুথির হরফের ব্যাপারে পণ্ডিতদের মন্তব্য হলো, এটি আসলে অর্বাচীন 'নেওয়ারি লিপি'।[১৫৪] 'নেওয়ারি লিপি'কে জোর করে 'প্রত্ন-বাংলা' বলার দরকার নেই আসলে।

চর্যাগীতির মলাটে নাগরী বর্ণ ও মূল পাঠে নেওয়ারি হরফ দেখে শাস্ত্রী নিজেও ভাষা নিয়ে সন্দেহে পড়ে গিয়েছিলেন।[১৫৫] আর এই ধরনের সন্দেহ আমাদের মনেও জাগে। প্রশ্ন করাই যায়, চর্যার মূল কবিরা কি তবে বাংলা বর্ণে লিখতে জানতেন না? যাঁরা সংকলন করেছেন পুথিগুলো, তাদের মধ্যেও কি কেউ বাংলা-লিখিয়ে ছিলেন না? নাকি জোর করে অন্য ভাষার সম্পদ বাংলার বলে দাবি করা হচ্ছে? আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

চর্যার ভাষা নিয়ে মতবিরোধ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাকে বাংলার সম্পদ হিসেবেই দাবি করেছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রীর 'সিদ্ধান্ত ভাষাতাত্ত্বিকেরা একবাক্যে অনুমোদন করেন

---

১৫১. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১১

১৫২. শামসুল আলম সাঈদ, *চর্যাপদ : তাত্ত্বিক সমীক্ষা*, পৃ. ১৮

১৫৩. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পৃ. ১৫

১৫৪. শামসুল আলম সাঈদ, *চর্যাপদ : তাত্ত্বিক সমীক্ষা*, পৃ. ১৮

১৫৫. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ১৫

নি।'[১৪৬] তাঁরা অনেক ভাষার নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন এখানে। ওড়িয়া, আসামি, মৈথিলী, হিন্দি-সহ অনেক ভাষার পণ্ডিত চর্যাকে দাবি করেছেন নিজেদের সম্পদ হিসেবে।[১৪৭] তাদের দাবি চর্যা 'বাঙ্গালা কিছুতেই নয়'।[১৪৮] দাবিগুলো আসলে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কেননা ড. সুনীতিকুমারের মতে, আসামী-ওড়িয়া-মৈথিলী ও বাংলা একই জায়গা থেকে এসেছে। এদের উৎপত্তি 'মাগধী অপভ্রংশ' থেকে।[১৪৯] 'তাই বাঙলার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আসামি ও ওড়িয়ার। আরো কয়েকটি ভাষারও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে বাঙলার সাথে; কেননা সেগুলোও জন্মেছিলো মাগধী অপভ্রংশের অন্য দুটি শাখা থেকে। ওই ভাষাগুলো হচ্ছে মৈথিলি, মগহি, ভোজপুরিয়া।'[১৫০]

ভাষাকেন্দ্রিক 'গোলমালের সূত্রপাত' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। এমনটাই জানিয়েছেন সুকুমার সেন। সুনীতিবাবু চর্যাপদে মৈথিলীর প্রভাব দেখেছেন এবং বলেছেন, দুইটি ক্রিয়াপদ (ভণথি, বোলখি) মৈথিলী হতে আগত।[১৫১] আমরা জানি, চর্যা লেখা হয়েছিল নেপালে। আর নেপালে মৈথিলী প্রচলিত ছিল। তাই চর্যায় মৈথিলীর প্রভাব

---

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৪৭. হুমায়ুন আজাদ, *কতো নদী সরোবর*, পৃ. ২৮; নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ২৯

১৪৮. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ৩৯

১৪৯. Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language*, p. 6

১৫০. হুমায়ুন আজাদ, *কতো নদী সরোবর*, পৃ. ১৪

১৫১. Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language*, p. 117

থাকা অস্বাভাবিক নয়।[১৫৭] আসলে এর মধ্য দিয়ে চট্টোপাধ্যায় কিন্তু চর্যাপদের ওপর অন্য ভাষার প্রভাব কার্যত স্বীকার করেছেন। ফলে এখন 'হিন্দীভাষী, মৈথিলীভাষী, উড়িয়াভাষী... ইহারা সবাই দাবি করিতেছেন যে চর্যাগীতির ভাষা হিন্দী, মৈথিলী এবং উড়িয়া'।[১৫৮]

আমরা এই অধ্যায়ে দেখার চেষ্টা করব চর্যা নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মতবিরোধটা আসলে কোন পর্যায়ের। ওগুলো এড়িয়ে কি বাংলার ব্যাপারে ঐকমত্য দাবি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? নাকি মতবিরোধগুলো আসলেই আমলে নেওয়ার যোগ্য?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যেদিন (১৯১৬) চর্যাকে বাংলা বলে দাবি করেছিলেন, সেদিনই বাধ সেধেছিলেন অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার। তিনি একে বাংলা মানতে নারাজ ছিলেন।[১৫৯] সেই জমানার মজুমদার থেকে নিয়ে হাল আমলের মোহাম্মদ আজম-সহ অনেকেই সওয়াল উঠিয়েছেন চর্যার ব্যাপারে। আঙুল তুলেছেন চর্যার ভাষা ও ছন্দের ওপর। তাঁদের আলোচনার প্রেক্ষিতে চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে সাধারণত সাতটি দাবি উপস্থিত হয়ে আসছে—'(১) ইহা কোন ভাষা নয়; একটি কৃত্রিম খিচুড়ি ভাষা। (২) ইহা অপভ্রংশ। (৩) ইহা হিন্দী (৪) ইহা মৈথিলী। (৫) ইহা ওড়িয়া। (৬) ইহা আসামী। (৭) ইহা বাঙ্গালা।'[১৬০]

চর্যাপদ আবিষ্কারের চার বছর পর (১৯২০) বিজয়চন্দ্র

১৫৭. প্রাগুক্ত

১৫৮. সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৩৯

১৫৯. Bijaychandra Mazumdar, *History of Bengali Language*, p 267

১৬০. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৮

মজুমদারের *History of Bengali Language* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি শাস্ত্রীর দাবিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেন। মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। তিনি কিছু কিছু চর্যায় 'Bengali predominates' আছে বলে স্বীকার করলেও বেশ কিছু চর্যা হিন্দিতে রচিত বলেই মনে করতেন। ছন্দগঠন ও ব্যাকরণ বিবেচনায় এমন মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক মজুমদার। নানা বিশ্লেষণের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চর্যার ভাষাকে কোনো নির্দিষ্ট 'dialect'-এর অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন। মজুমদারের ভাষায় :

> Looking to the metrical system and the grammatical forms, some verses may be declared to be composed in Hindi. Generally the language of many effusions is such a jumble of various words and grammatical forms of various provinces and of various times, that we can hardly say that the writings represent any particular dialect.[১৫৬]

মজুমদার মনে করতেন—চর্যা হলো বিভিন্ন ভাষা ও শব্দের এলোমেলো মিশ্রণ। এগুলো লেখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। মজুমদার *বঙ্গবাণী* (১৯২১-২৭) পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেছেন চর্যাপদ নিয়ে। তাঁর বিবেচনায়—ব্যাকরণগত সার্বিক বিশেষত্ব দিয়ে বিচার না করে 'গোটাকতক শব্দ দেখিয়া' বিচার করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ফলে তিনি 'প্রতিপদে ভুল' করেছেন। মজুমদারের অভিযোগ—চর্যার ভাষা-বিচারের সময় প্রাচীন প্রাকৃত ও অপভ্রংশের দাবি বিবেচনায়

---

১৫৬. Bijaychnadra Mazumdar, *History of Bengali Language*. p. 242

নেননি শাস্ত্রী। এমনকি 'নেপালী, মৈথিলী, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার কোন প্রাদুর্ভাব আছে কিনা' তাও 'বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই'।[১৫৭] ফলে বেধেছে গন্ডগোল। *বঙ্গবাণী*-তে প্রকাশিত মজুমদারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আমরা নিচে তুলে ধরছি :

- ছাপার পাঠ ঠিক আছে কি না, সেটা পরখ করার সুযোগ কাউকে দেননি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি একাই সবগুলো লিপি কপি করেছেন। আবার নিজেই সেগুলো ফেরত পাঠিয়েছেন নেপালে। অন্যদের দ্বারা পুথিটি সম্পাদনা করানো হয়নি। ক্রসচেকও হয়নি।
- এক শব্দের গায়ে অন্য শব্দের অক্ষর যুক্ত করে একেবারে হযবরল অবস্থা করে ফেলেছেন। যেমন : অপভ্রংশের 'মে' শব্দটির সাথে পরবর্তী শব্দের 'ন' যুক্ত করে 'যেন' বানিয়েছেন হরপ্রসাদ বাবু। পরবর্তী 'নভজ্জলু' শব্দটি হয়ে গেছে 'তজ্জলু'। এটা শাস্ত্রীর চর্যাপদের ভাষা না জানার ফল।
- টীকাতে স্পষ্টতই লেখা আছে, চর্যার গানগুলো চতুষ্পদী বা চৌপাই। এটা বাংলার ইতিহাসে অজ্ঞাত। এখন পর্যন্ত কোনো বাংলা রচনাতে এর পরিচয় পাওয়া যায় না। এর সাথে সাদৃশ্য আছে হিন্দি রীতির। উচ্চারণের ধরন, ছন্দ ও ভাষার বিচারে এ কালের হিন্দির সাথে চর্যার মিল পাওয়া যায়।
- শাস্ত্রী মহাশয় চর্যার ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রাকৃত অথবা অপভ্রংশকে বিবেচনায় আনেননি। সেখানে নেপালি, মৈথিলী, আসামি কিংবা ওড়িয়ার কোনো

১৫৭ বঙ্গবাণী, সপ্তম বর্ষ, চৈত্র ১৩৩২

প্রাদুর্ভাব আছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখেননি।[১৫৮]

- চর্যা ও দোহার ভাষাকে সমসাময়িক বাংলা মনে করেছেন হরপ্রসাদ বাবু। কিন্তু গানগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভাষায় লেখা। যাঁরা প্রাচীন প্রাকৃত ব্যাকরণ জানেন, তাঁরা একটু চোখ বোলালেই বিষয়টা ধরতে পারবেন। কাহ্নপার ভাষা সরহের চেয়ে ভিন্ন। এটাও খেয়াল করার মতো।
- প্রাকৃত বা অপভ্রংশের ব্যবহার দোহাতে বেশি। এগুলোকে যদি বাংলা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, তবে সকল প্রাকৃত ও অপভ্রংশই বাংলা, এমনকি বেদের ভাষাও বাংলা। কেননা সেখানে আমাদের ব্যবহৃত অগ্নি ও পুরোহিত টাইপের শব্দও আছে!
- অনেক ক্ষেত্রেই মূল লেখকের নাম দেওয়া ছিল না। কিন্তু যিনি টীকা লিখেছেন, তিনি অনুমান করে সেগুলো যুক্ত করে দিয়েছেন।[১৫৯]
- রচয়িতাদের নাম ধরে ধরে কাল নির্ধারণ করা মোটেও ঠিক হয়নি। কারণ, এগুলো তাদের আসল নাম নয়। দু-একজন বাদে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নামগুলো দিয়ে তরিকা বোঝানো হয়েছে। কে কোন রীতিতে ভজন-সাধন করত, সেটা বোঝানো হয়েছে। বিষয়টি শাস্ত্রী মহাশয় ধরতে পারেননি।
- নানান প্রদেশের সহজিয়ারা এক জায়গায় জড়ো হয়ে গানগুলো লিখেছিলেন। সেটা উত্তর-পশ্চিমের কোনো একটি স্থান হতে পারে।

---

১৫৮. *বঙ্গবাণী*, চতুর্থ বর্ষ, পৌষ ১৩৩২, পৃ. ৬২২-৬২৫

১৫৯. *বঙ্গবাণী*, চতুর্থ বর্ষ, মাঘ ১৩৩২, পৃ. ৭৪২-৭৪৮

- রচনাগুলো প্রাচীন অপভ্রংশে লেখা হয়েছে। তবে প্রত্যেক কবিই নিজেদের আঞ্চলিকতা ধরে রেখেছেন শব্দে শব্দে। ১৫০০ সাল পর্যন্তও প্রাকৃত ভাষায় লেখালেখি ফ্যাশনের মতো ছিল। কাজেই, চর্যাপদকে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা* ভাষা বলা চলে না : 'উহা হাজার বছরের পুরাণ নয়, ও ঐ ভাষাকে বাঙ্গলা ভাষা বলা চলে না।'[১৬০]

মজুমদারের পর যাঁরা শাস্ত্রীর সমালোচনা করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)। তিনি অনেকাংশেই মজুমদারের মতকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে—দোহার ভাষায় 'বাঙ্গালা-ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য পাওয়া' গেলেও আসলে সেটা 'হিন্দী প্রভৃতি ভাষারই নিকটতর বলিয়া মনে হয়'। শাস্ত্রী যে-সকল শব্দকে বাংলা বলে শনাক্ত করেছেন 'তাহা পার্শ্ববর্ত্তী প্রাদেশিক ভাষাগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়'। গবেষণার মাধ্যমে 'ঐ সকল দোহা ও গানের ভাষা হিন্দী প্রভৃতি ভাষারই নিকটতর বলিয়া মনে হয়'। সেনের ভাষায় :

> উড়িয়া, হিন্দী, বাঙ্গলা, মৈথিলী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অনেকটা একরূপ ছিল, তখন ইহাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য খুব বেশী ছিল। এই কারণে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংকলিত দোহাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা-ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু "বৌদ্ধ দোহা ও গান" এবং "ডাকার্ণব" কখনই বাঙ্গলা ভাষার আদিরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহাদের সঙ্গে হিন্দীর সাদৃশ্যই বেশী। যে সকল শব্দ 'বাঙ্গলা শব্দ' বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী

১৬০. *বঙ্গবাণী*, পঞ্চম বর্ষ, চৈত্র ১৩০২; পৃ. ২৪১-২৪৭

প্রাদেশিক ভাষাগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া অপরাপর লক্ষণ অনুধাবন করিলে ঐ সকল দোহা ও গানের ভাষা হিন্দী প্রভৃতি ভাষারই নিকটতর বলিয়া মনে হয়। স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিবিধ ভাষাবিদ্ পণ্ডিতের এই মত, এবং যতদূর জানিয়াছি তাহাতে ডাঃ সিলভ্যান লেভি, ডাঃ ব্লক ও ডাঃ গ্রিয়ারসনেরও কতকটা একই মত।'[১৬১]

কয়েকজন লেখকের বাসস্থান বঙ্গদেশে এ কথা মেনে নিলেও, 'তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে সেই সেই লেখক বঙ্গভাষায় দোঁহা লিখিয়াছিলেন'। সেন স্বীকার করেন যে, কাহ্নপার ভাষায় 'মাঝে মাঝে বাঙ্গলার লক্ষণ একটু একটু দৃষ্ট হয়', কিন্তু সেটা 'বাঙ্গলা ভাষারই আদিরূপ বলিয়া নিঃসন্দেহে গৃহীত হইবার জন্য যথেষ্ট নয়'। তিনি জোর দাবি করেন যে, 'দোঁহাকারেরা যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা আদৌ বাঙ্গলা নহে'। তাই 'ইহা মনে করাই বেশী সঙ্গত যে তাঁহারা তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার কবিতা লিখিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহাদের লেখার টিকা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইবে কেন? সেই সকল কবিতার ভাষার লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিলে বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয় না, পার্শ্ববর্ত্তী প্রাদেশিক ভাষাগুলির কোন কোনটির সঙ্গেই তাহাদের বেশী সাদৃশ্য।'[১৬২]

সেনের পর উল্লেখ করা যায় বিখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-এর (১৮৮৫-১৯৬৯) কথা। তিনি যদিও চর্যাকে বাংলার সম্পদ বলার পক্ষপাতী, কিন্তু এর পরেও পাঁচজন

---

১৬১. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৬২

১৬২. *প্রাগুক্ত*

চর্যাকারের ভাষা বাংলা নয় বলে মন্তব্য করেছেন। শহীদুল্লাহ্-এর মতে, শান্তি ও মহীধরের ভাষা মৈথিলী, আর্যদেবের ভাষা ওড়িয়া, কঙ্কণের ভাষা অপভ্রংশ-ঘেঁষা। জয়নন্দীর ভাষা অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বা প্রত্ন-ওড়িয়া-মৈথিলী-বাংলা-অসমিয়া। আর কাহ্ন-সরহ-ভুসুকুর ভাষা হলো বঙ্গ-কামরূপী। এই সকল কারণে তিনি বলেন : 'আমরা বৌদ্ধগানের বঙ্গালা ভাষাকে... বৈজ্ঞানিকভাবে প্রাচীন বঙ্গ-কামরূপী ভাষা বলাই সঙ্গত মনে করি।'[১৬৩]

অধ্যাপক সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২) চর্যাপদের ভাষা নিয়ে প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। শুরুতে এই ভাষাকে তিনি বলেছেন প্রত্ন-বাংলা-উড়িয়া-অসমিয়া-মৈথিলী। চর্যা নেপালে পাওয়া যাওয়ায় মৈথিলীর প্রভাব তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। কারণ, সেখানে মৈথিলীর বহুল প্রচলন ছিল।[১৬৪] অপর দিকে 'অসমীয়াভাষীদের দাবী অযৌক্তিক নয়' বলেও মনে করেন অধ্যাপক সেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'ষোড়শ শতাব্দী অবধি দুই ভাষার বিশেষ তফাৎ ছিল না।'[১৬৫]

ড. এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২) এই ভাষাকে বলেছেন 'অপভ্রংশ ভাষা', যা তৎকালীন আমজনতার ভাষা।[১৬৬] ড. কাজী দীন মুহম্মদ (১৯২৭-২০১১) মনে করতেন চর্যাপদের ভাষার সাথে 'পশ্চিমের মৈথিলি ও দক্ষিণের ওড়িয়া ভাষারও

---

১৬৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭১

১৬৪ কৃষ্ণপদ নাথ, *চর্যাপদ : ভাষা পাঠ রূপান্তর*, পৃ. ২৬

১৬৫ সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ৩৯

১৬৬ M Enamul Haq, 'Muslim Contributions to the Development of Bengali Language and Literature', in *East Pakistan: A Profile*, Edited by S Sajjad Hussain p 103

মিল' রয়েছে।[১৬৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. এস এম লুৎফর রহমান (১৯৪১-২০১৯) দীর্ঘ গবেষণা করেছেন বাংলা ভাষা ও লিপির উদ্ভব নিয়ে। গবেষণার সারাংশ হিসেবে তিনি বলেন :

> যাঁরা চর্যাপদকে বাঙালা রচনা নয় বলেছেন—বাংলা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস লিখতে গিয়ে; তাঁদের সাথে আমি একমত হতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, চর্যাপদের লিপি ও ভাষা; অঙ্গ এলাকার (বর্তমান ভারতের ভাগলপুর-প্রদেশ[১৬৮]) প্রাচীন লিপি ও ভাষা বলে প্রমাণ পেয়েছি।[১৬৯]

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম তো স্পষ্ট বলেছেন—'চর্যাপদের ভাষাকে ঠিক বাংলা বলা উচিত নয়'। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'যে ভাষায় চর্যাপদ লেখা হয়েছিল, তা বাংলাসহ অনেকগুলো ভাষার সাধারণ সম্পত্তি, এবং এসব ভাষা বর্তমান রূপে বিকশিত হওয়ার আগেই চর্যাপদ লেখা হয়েছিল।'[১৭০]

মৈথিলী ভাষার দাবি

মৈথিলী ভাষার গবেষকরা চর্যাকে নিজেদের সম্পদ বলে দাবি করেছেন। এঁদের পথ খুলে দিয়েছিলেন সুনীতিকুমার। কেননা,

---

১৬৭. কাজী দীন মুহম্মদ, 'বাংলা ভাষা ও লিপির ইতিহাস', আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০৮

১৬৮. ভাগলপুর (Bhagalpur) বর্তমানে ভারতের বিহার রাজ্যের ভাগলপুর জেলার একটি শহর ও পৌর কর্পোরেশনাধীন এলাকা।

১৬৯. এস. এম. লুৎফর রহমান, *বাঙালীর লিপি ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস*, ৩/৭৪।

১৭০. মোহাম্মদ আজম, তথ্য, সত্য ও ইতিহাস, পৃ. ২

তিনি চর্যায় মৈথিলীর প্রভাব দেখতে পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন।[১৭১] আমরা আগেই সেটা বর্ণনা করেছি। এ ছাড়া শিবনন্দন ঠাকুর মৈথিলী দাবির অন্যতম উদ্যোক্তা (১৯৪১)। পরে তাঁর সাথে যুক্ত হন ড. জয়কান্ত মিশ্র।[১৭২] তিনি তাঁর *A History of Maithili Literature* (১৯৪৯) গ্রন্থে জোর দিয়ে বলেন, চর্যার গানগুলো 'প্রাচীন মৈথিলীর উদাহরণ'। মিশ্রের বিচারে দোহাগুলো 'অপভ্রংশে লেখা' হলেও চর্যাগীতি ও ডাকার্ণব মৈথিলীতে রচিত। তাঁর উপসংহার হলো, চর্যাপদের ভাষা আসলে 'চিকা-চিকি' অঞ্চলের একটি প্রত্ন-মৈথিলী (Proto-Maithili) উপভাষা। এটি আদর্শ বাংলা ও আদর্শ মৈথিলীর ঠিক মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছে। মিশ্রের ভাষায় :

> To sum up, the language of the Caryapadas represents a Proto-Maithili dialect of the Chika-Chiki area, midway between Standard Maithili and Standard Bengali, having some (esp. archaic) features in common with other Magadhan speeches.[১৭৩]

মিশ্রের সাথে সুর মিলিয়েছেন সুভদ্র ঝাঁ তাঁর *Formation of the Maithili Langauge* (১৯৫৮) গ্রন্থে। তিনি সেখানে চর্যাপদকে মৈথিলী ভাষার প্রাচীন নিদর্শন বলে দাবি করেছেন। কনকলাল বড়ুয়া অবশ্য একে বলেছেন 'মিশ্র মৈথিলী-

---

১৭১. Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language*, p. 117

১৭২. মৃণাল নাথ, *চর্যাপদ : ভাষা পাঠ রূপান্তর*, পৃ. ৩৬, ৪৩-৪৪

১৭৩. Jayakanta Mishra, *A History of Maithili Literature*, p. 110

কামরূপী'।[১৭৪] দিবাকর-সম্পাদিত *Bihar through the Ages* গ্রন্থে চর্যাকে 'a sample of old Maithili' রূপে অভিহিত করা হয়েছে।[১৭৫] এ ছাড়া ড. জয়ধারী সিংহ, পি কে জয়সওয়াল প্রমুখ পণ্ডিত চর্যাগীতির ভাষাকে মৈথিলীর কাছাকাছি বলেছেন। তাঁদের মতে, 'চর্যার ভাষার সঙ্গে মৈথিলি ভাষার রূপগত ও ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে। চর্যাগানে যে নাসিক্য ধ্বনি আছে তা মৈথিলি ভাষাতেই বেশি পাওয়া যায়। করণে "এ" বিভক্তি, সর্বনামের ব্যবহার ইত্যাদি মৈথিলি ভাষার লক্ষণ। চর্যায় ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনেও মৈথিলি ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।'[১৭৬] সুভদ্র ঝাঁ অবশ্য চর্যাকে খাঁটি মৈথিলী না বলে চিকাচিকি অঞ্চলের 'প্রত্ন-মৈথিলী' (Proto-Maithili) ভাষা বলেছেন।[১৭৭]

ওড়িয়া ভাষার দাবি

চর্যার ওপর ওড়িয়া ভাষার দাবি প্রথম উত্থাপিত হয় ষষ্ঠ নিখিল ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে (১৯৩০)। গোপাল চন্দ্র প্রহরাজ তাঁর আলোচনায় এই দাবি করেন। চর্যার কিছু ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ও শব্দ-ব্যবহারের নমুনা উপস্থাপন করে কুঞ্জবিহারী ত্রিপাঠী (১৯৬২) এবং বংশীধর মহাড়ি (১৯৬২) দাবি করেন যে, একমাত্র ওড়িয়াতেই এগুলো পাওয়া সম্ভব।[১৭৮] তাঁদের মতে,

১৭৪. *Formation of the Maithili Langauge*, p. 32; উদ্ধৃত: মৃণাল নাথ, ভাষা : ভূত পরে রূপান্তর, পৃ. ২৭

১৭৫. R. Diwakar, *Bihar Through The Ages* (Bihar: Orient longmans, 1958)

১৭৬. মহবুবুল হক, চর্যাগীতি পাঠ, পৃ. ২৩২

১৭৭. সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১৭৮. সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; মৃণাল নাথ, ভাষা : ভূত পরে রূপান্তর, পৃ. ২৮।

চর্যাগীতি প্রাচীন ওড়িয়া ভাষার নিদর্শন। ড. খগেশ্বর মহাপাত্র ওড়িয়া ভাষায় *চর্যাগীতিকা* (২০১৭) নামে বই লিখেছেন।[১৭৯] 'প্রত্ন-ওড়িয়া' (Proto-Oriya) নামে *চর্যাগীতিকা*-ভিত্তিক ওড়িয়া ব্যাকরণও রচনা করেছেন তিনি। ড. মায়াধর মানসিংহ তাঁর *History of Oriya Literature* (১৯৬০) গ্রন্থে অধিকাংশ চর্যাকারকে ওড়িয়া কবি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন।[১৮০] এ ছাড়া করুণাকর তাঁর *আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়*-এ যুক্তি সহকারে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, চর্যাগীতি মূলত ওড়িয়া ভাষায় রচিত। ড. হরেকৃষ্ণ মাহতাব তাঁর *History of Odissa* গ্রন্থে বলেছেন, 'চর্যাগীতি ওড়িয়া ভাষায় রচিত এবং চর্যাপদের কবিরা ভৌম রাজাদের আমলে উড়িষ্যায় আবির্ভূত হয়েছিলেন।'[১৮১]

করুণাকর-এর মতে—বজ্রযান বৌদ্ধধারার উৎপত্তিস্থল ছিল ওড়িশা। এই ধারাতেই প্রথমবার বৌদ্ধধর্মে নারীতত্ত্ব বা শক্তির পূজার সূচনা হয়। এর ফলে মাতৃদাক্ষিণী দেবীর পূজা এবং কায়া সাধনা প্রচলিত হয়। চর্যাপদের পদগুলোতে আদি সিদ্ধাচার্যদের প্রবর্তিত কায়া সাধনা এবং শক্তি (নারীতত্ত্ব) পূজার ভাবনা ও অভিজ্ঞতা কাব্যিক রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই পদগুলির ভাষা মিশ্রধর্মী, যাতে তৎকালীন ভারতের প্রাচ্য অঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃত-অপভ্রংশের রূপ ফুটে উঠেছে। সেই কারণে ধারণা করা হয়, এর কবিরাও এই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাস করতেন বর্তমান ওড়িশায়। সেখানে তাঁরা তাঁদের ধর্ম প্রচার করতেন। ওড়িশার ধর্মীয় সাহিত্যে এই

---

১৭৯. খগেশ্বর মহাপাত্র, *চর্যাগীতিকা* (ওড়িশা: ফ্রেন্ডস পাবলিকেশন, ২০১৭)

১৮০. Mayadhar Mansinha, *History of Oriya Literature* (New Delhi: Sahitta Akademi, 1960)

১৮১. মাহবুবুল হক, *চর্যাগীতি পাঠ*, পৃ. ২০৩

কবিদের বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৮২] কাজেই, ওড়িয়া ভাষাভাষীদের দাবির বিষয়টি ওড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বরং আমলে নেওয়ার যোগ্য বলেই প্রতীয়মান হয়।

অসমিয়া ভাষার দাবি

চর্যাকে অসমিয়া ভাষায় রচিত বলে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন পরীক্ষিত হাজরিকা (১৯৭৩)। তাঁর মতে, শাস্ত্রী মহাশয় পাঠ-সংশোধনের নামে চর্যার অনেক শব্দ ও রূপ পরিবর্তন করেছেন। তাঁর মতে, চর্যার লিপি 'প্রাচীন কামরূপী'তে লেখা।[১৮৩] ড. হাজরিকা অসমিয়া ভাষায় লেখা *চর্য্যাপদ* গ্রন্থে চর্যাগানগুলোর ভাষা, সমাজচিত্র, কবি-পরিচয়, ধর্ম-ভাবনা ইত্যাদি আলোচনার পর বলেন,

> চর্য্যাপদবোৰত অষ্টম শতিকাৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰৰ প্রাচ্য ভাৰতৰ ভাষা, সাহিত্য আৰু ধর্মীয় সংস্কৃতিৰ নিদর্শন ফুটি উঠিছে। অধিকাংশ চর্য্যাপদৰ ভাষা, ধ্বনি-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, শব্দ-সম্ভাৰ, সেইবোৰৰ বানন-পদ্ধতি, পদ-চয়নৰ ৰীতি, ৰূপক-উপমাৰ প্রয়োগ, ফকৰা-যোজনা, নীতি-বচনৰ ব্যৱহাৰ, গ্রাম্য চিত্রৰ অঙ্কণ আৰু বিভিন্ন ৰাগৰ সংযোজন আদিয়ে প্রাচীন অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য আৰু সমাজ-সংস্কৃতিৰ লগত চর্য্যাপদৰ তেজ-মঙহৰ সম্পর্ক প্রতিপন্ন কৰে।... চর্য্যাপদৰ ভাষা কামৰূপী অপভ্রংশৰ ভেটিত গঢ়ি উঠা ধর্মীয় প্রলেপসনা এটি সাহিত্যিক ভাষা।[১৮৪]

---

১৮২. Amaresh Datta, *The Encyclopaedia of Indian Literature*, Vol 1, p. 647

১৮৩. পরীক্ষিত হাজরিকা, *চর্য্যাপদ*, পৃ. ২৬

১৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৬

ড. হাজরিকার আলোচনার ব্যাপারে মৃণাল নাথ বলেছেন,

> চর্যার ভাষা যে অসমিয়া ভাষার আদি নিদর্শন সে বিষয়ে তাঁর আলোচনা খুবই বিস্তৃত, অন্য দাবিদারেরা এত বিশদ আলোচনা করেছেন বলে দেখি নি।[১৮৫]

সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা তাঁর *অসমিয়া সাহিত্যের সমীক্ষাত্মক (১৯৮১) ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে দাবি করেছেন, চর্যাগানগুলোর ভাষা অসমিয়া।'[১৮৬] তিনি 'কয়েকজন সিদ্ধাচার্যকে আসামির বৌদ্ধসাধক বলে দাবি করেন।' কারণ, 'তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা তৎকালে আসামেই হয়েছিল বেশি'।[১৮৭] 'আর চর্যার গানে মাগধী, শৌরসেনী এবং অপভ্রংশ ভাষার যে প্রভাব দেখা যায় তার সাথে অসমিয়া ভাষার নৈকট্য যথেষ্ট। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তিত হলেও চর্যাগীতির কোনো কোনো শব্দ ও প্রবাদ-প্রবচন এখনো আসামে প্রচলিত। এদিক থেকে তিনি চর্যাগীতিকে অসমিয়া সাহিত্যের ভিত হিসেবে বিবেচনা করতে চেয়েছেন।'[১৮৮]

'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সুকুমার সেন প্রমুখ চর্যাপদের ভাষার ওপর আসামি ভাষার দাবিকে কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের বিবেচনায়, চর্যা রচনার কালে আসামি মূল বাংলা ভাষার ধারা থেকে বিযুক্ত হয়নি।'[১৮৯]

---

১৮৫. মৃণাল নাথ, *চর্যাপদ : ভাষা পাঠ রূপান্তর*, পৃ. ২৮

১৮৬. মাহবুবুল হক, *চর্যাগীতি পাঠ*, পৃ. ১০২

১৮৭. শামসুল আলম সাঈদ, *চর্যাপদ : তাত্ত্বিক সমীক্ষা*, পৃ. ২৩

১৮৮. মাহবুবুল হক, *চর্যাগীতি পাঠ*, পৃ. ১০২

১৮৯. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; আরও দেখুন: পরীক্ষিত হাজরিকা, *চর্যাপদ*, পৃ. ১৪-২৫

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি ড. শহীদুল্লাহ্ চর্যার ভাষাকে 'বঙ্গ-কামরূপী ভাষা বলাই সঙ্গত' মনে করেছেন।[১৯০] আর কামরূপ যে বর্তমান আসামের অন্তর্ভুক্ত, এ কথা তো সকলেই জানেন।[১৯১] অপর দিকে শহীদুল্লাহ্ এও বলেছেন, 'এই বঙ্গ-কামরূপী ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বাঙ্গালা ও আসামীতে পরিণত হইয়াছে।'[১৯২]

হিন্দি ভাষার দাবি

বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যাতে হিন্দির প্রবণতা লক্ষ করেন ১৯২০ সালেই। চর্যার ওপর হিন্দিভাষীদের দাবি মোটাদাগে তিনটি যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত: '(১) চর্যার শব্দরূপ হিন্দী শব্দরূপের অনেক কাছাকাছি, (২) চর্যা হিন্দীর চির-অভ্যস্ত দোহাছন্দে রচিত, (৩) চর্যার কবিরা হিন্দীভাষী বিহারের অধিবাসী।'[১৯৩]

হিন্দির এই দাবিকে যুক্তিসংগত প্রমাণে প্রথম প্রয়াসী ছিলেন চর্যাপতি রাহুল সাংকৃত্যায়ন। এ ছাড়া স্যার যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৬৮), কাশী প্রসাদ জয়সওয়াল (১৮৮১-১৯৩৭) প্রমুখ পণ্ডিতেরাও চর্যার ভাষাকে মনে করতেন প্রাচীন হিন্দি। শাস্ত্রী তাঁর জীবদ্দশায় যদুনাথ সরকারকে চর্যাপদের বিভিন্ন লাইন পড়ে শুনিয়েছিলেন। শোনার পর তিনি বিস্ময় নিয়ে বলেছিলেন: 'মহাশয়, এ যে পাক্কা হিন্দী।'[১৯৪] উল্লেখ্য,

---

১৯০. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, ৭১

১৯১. Vincent A. Smith, *The Early History of India*, p. 340; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, ১৬৮-১৬৯

১৯২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১৮; *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯

১৯৩. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ২৮-২৯

১৯৪. *বঙ্গবাণী*, পঞ্চম বর্ষ, চৈত্র ১৩৩২; পৃ. ২৪১-২৪৭

রাহুল সাংকৃত্যায়ন চর্যাপদকে সরাসরি হিন্দি না বলে এর ভাষাকে চিহ্নিত করেছেন বিহারি, মাগধী, মগহী ও মৈথিলী অভিধায়।[১৯৫] কারণ, এগুলোর সাথে সরাসরি আত্মীয়তা রয়েছে বাংলা ভাষার (মৈথিলী, মগহি, ভোজপুরিয়া জন্মেছিল মাগধী অপভ্রংশের অন্য দুটি শাখা থেকে)।[১৯৬] তবে সাংকৃত্যায়ন 'তাঁর সংকলিত *হিন্দি কাব্যধারা* গ্রন্থে লুই, শবর, ভুসুকু, কাহ্ন প্রমুখ অধিকাংশ সিদ্ধাচার্যের পদকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ধর্মবীর ভারতী চর্যাগান নিয়ে লেখা তাঁর পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ *সিদ্ধাসাহিত্য*-এ চর্যাগীতিগুলোকে হিন্দি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।'[১৯৭] একই দাবি জয়সওয়ালেরও। তিনি বলেছেন, 'চর্যার কবিগণ সকলেই বিহারী এবং ইহার ভাষা প্রধানতঃ পাটনা ও গয়ার প্রাচীন ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত।'[১৯৮]

অন্যান্য ভাষার দাবি

সামসময়িক ঝাড়খণ্ডি অনেক গবেষকগণ মনে করেন, চর্যাপদ 'কুড়মালি' ভাষার নিকটবর্তী। সজল বসু তাঁর *Jharkhand Movement: Ethnicity and Culture of Silence* গ্রন্থে ঠিক এমনটাই জানিয়েছেন।[১৯৯] 'এ-সব দাবির পাশাপাশি চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রাম, সিলেট, বরাক উপত্যকা প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার সাদৃশ্য প্রতিপাদনের প্রয়াসে নানা গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচিত

---

১৯৫. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

১৯৬. হুমায়ুন আজাদ, *কতো নদী সরোবর*, পৃ. ১৪

১৯৭. মাহবুবুল হক, *চর্যাগীতি পাঠ*, পৃ. ২৩৩

১৯৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৬-১৭৭

১৯৯. Sajal Basu, *Jharkhand Movement: Ethnicity and Culture of Silence*, P. 24

হয়েছে।'[২০০]

মতবিরোধের আরও কিছু দিক

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ভাষাবিদ মৃণাল নাথ[২০১] ও অলিভা দাক্ষী[২০২] তাঁদের গবেষণার পর বলেছেন যে, চর্যা 'অবহট্‌ঠ' ভাষায় লিখিত। মৃণাল নাথ দেখিয়েছেন, যে-সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য চর্যাপদকে বাংলার সম্পদ বলে দাবি করা হয়, তা 'পূর্বাঞ্চলীয় অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায়ও পাওয়া যায়'। এ ছাড়া চর্যার সেইসব বৈশিষ্ট্যের 'অধিকাংশই' অবহট্‌ঠ থেকে প্রাপ্ত। চর্যার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাগ্‌ধারা, ছন্দ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করার পর তিনি বলেন, এর সঙ্গে অবহট্‌ঠ-এর 'প্রভূত মিল রয়েছে'। সে কারণে, চর্যার ভাষাকে 'মাগধী অবহট্‌ঠ' বলাকেই তিনি 'যুক্তিযুক্ত' মনে করেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করেও তিনি দেখিয়েছেন যে, চর্যাপদ রচিত রয়েছে অবহট্‌ঠ-এর কালেই (৬০০-১২০০ খ্রি.)।[২০৩]

চর্যাপদে অবহট্‌ঠ-এর ছাপ খুবই স্পষ্ট।[২০৪] চর্যায় ব্যবহৃত হয়েছে নিষ্ঠান্ত-ইউ-উ যুক্ত কিউ, বিআইউ, বিকসউ, থাকিউ, বাহিউ ইত্যাদি পদ। এগুলো 'শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব' বহন। ড. নির্মল দাশ বলেন: 'অপভ্রংশের অপর প্রভাব—জো, সো, কো, জসু, তসু, প্রভৃতি সর্বনাম পদ, জিম, তিম

---

২০০. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২০১. মৃণাল নাথ, *চর্যাপদ : ভাষা পাঠ রূপান্তর*, পৃ. ৩৪

২০২. অলিভা দাক্ষী, *চর্যা-গীতি ভাষা ও শব্দকোষ*, (কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১)

২০৩. মৃণাল নাথ, *চর্যাপদ : ভাষা পাঠ রূপান্তর*, পৃ. ৩৬, ৪৩-৪৪

২০৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৭

প্রভৃতি সর্বনামজাত ক্রিয়াবিশেষণ এবং জইসন, তইসন ইত্যাদি সর্বনামজাত বিশেষণ। উল্লেখিত সমস্ত পদই মূলত অপভ্রংশের অন্তর্গত, কিন্তু চর্যায় এগুলি অবাধে ব্যবহৃত হয়েছে।'[২০৫]

চর্যার সঙ্গে অবহট্‌ঠ ভাষার সম্পর্কের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত অবশ্য সুনীতিকুমারের *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থেই আছে। তিনি জানিয়েছেন, 'পাঞ্জাব' থেকে 'বঙ্গ' পর্যন্ত এটি শুধু 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা'ই ছিল না, কবিতার ভাষা হিসেবেও ছিল অনন্য। পূর্বাঞ্চলের কবিরা তাঁদের আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে 'শৌরসেনী অপভ্রংশ' ব্যবহার করতেন। এটি ছিল তৎকালীন শিষ্ট ভাষা (polite language)। পূর্বাঞ্চলে নব্যভারতীয় আর্যভাষা উদ্ভবের পরেও এর কদর ছিল বেশ।[২০৬] এই কথা স্বীকার করেছেন গোপাল হালদারও।[২০৭]

চর্যা যখন লেখা হচ্ছিল, তখন উত্তর ভারতের মুখের ভাষা ছিল 'শৌরসেনী অবহট্‌ঠ'। 'রাজপুত রাজাদের প্রভাবে শৌরসেনী অবহট্‌ঠ খ্রীঃ ৮ম শতকের পর থেকে উত্তর-ভারতের প্রায় রাষ্ট্রভাষা হয়ে ওঠে।'[২০৮] পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অবস্থাও ছিল একই রকম। অসিতকুমার জানাচ্ছেন, 'শৌরসেনী' ভাষা ওইসময় 'পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে একমাত্র শিষ্ট ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত।' এমনকি 'বাঙলা দেশেও শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভূত আধিপত্য ছিল' বলে জানিয়েছেন বন্দ্যোপাধ্যায়।[২০৯]

---

২০৫. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ২৭

২০৬. Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language*, p. 91, 118

২০৭. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯

২০৮. *প্রাগুক্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯

২০৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৮

এখানে বলে রাখা ভালো, 'শৌরসেনী অপভ্রংশ' বলতে কিন্তু 'অবহট্‌ঠ'কেই বোঝায়। গোপাল হালদার বলেন :

> এদিকে খ্রীঃ ৬০০ থেকে খ্রীঃ ১,০০০-এর মধ্যে লোকের মুখের ভাষা এভাবে পরিবর্তিত হতে হতে প্রাকৃতের যে-রূপ দাঁড়ায় তাকে আর তখনকার মানুষ প্রাকৃত বলত না; বলত 'অপভ্রংশ', চল্‌তি কথায় 'অবহট্‌ঠ' (অপভ্রষ্ট)... মূলত আমরা 'শৌরসেনী অপভ্রংশে'রই লিখিত নিদর্শন পাই; অন্যান্য প্রাকৃতের 'অপভ্রংশ দশা'র প্রমাণ পাই না। এইজন্যই 'অবহট্‌ঠ' বলতেই বোঝায় 'শৌরসেনী অপভ্রংশ'; অন্য অপভ্রংশগুলি ছিল অবজ্ঞেয়।[২১০]

চর্যার লিঙ্গরীতিও 'মোটামুটি অবহট্‌ঠের মতই' বলে জানিয়েছেন সুকুমার সেন। এমনকি চর্যায় ব্যবহৃত তিন প্রকার ছন্দও 'অবহট্‌ঠ হইতে আগত' বলে মত প্রকাশ করেছেন তিনি।[২১১] কাজেই, চর্যার ব্যাপারে 'অবহট্‌ঠ'-এর দাবি একেবারে ফেলনা নয়। এর পেছনে অবশ্যই শক্ত যুক্তি রয়েছে।

চর্যার ব্যাপারে মতবিরোধের আরেকটি দিক হলো, এটা পূর্ববঙ্গীয় নাকি পশ্চিমবঙ্গীয়? অর্থাৎ রাঢ়ীয় নাকি বঙ্গীয়?

যাঁরা চর্যাকে বাংলার সম্পদ বলে একমত পোষণ করেছেন, তাঁদের অনেকেই আবার এইখানে এসে একতা ধরে রাখতে পারেননি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, গোপাল হালদার[২১২] প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতরা এর ভাষাকে বলেছেন রাঢ়ী। চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'The language of the Caryas seems

২১০. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯

২১১. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ৪১-৪২

২১২. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯

to be based on a West Bengal dialect' ।[২১৩] সেনের ভাষায়– 'চর্য্যাপদগুলি রাঢ় অঞ্চলের ভাষায় রচিত হইয়াছিল।'[২১৪] কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন: 'আমরা বৌদ্ধগানের বাঙ্গালা ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের নির্দেশ না করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা কিংবা... বৈজ্ঞানিকভাবে প্রাচীন বঙ্গ-কামরূপী ভাষা বলাই সঙ্গত মনে করি।'[২১৫]

এ ছাড়া সৈয়দ মুর্তাজা আলী (১৯০২-১৯৮১) দেখিয়েছেন যে, 'চর্যার বেশ কিছু শব্দ এবং বাক্যবন্ধ পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ভাষাতে লব্ধ।' তিনি বলেছেন: 'চর্যাপদে অনেক স্থলে নাস্তিবাচক (negative) বাক্যে "না" ক্রিয়ায় পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরঙ্গের উপভাষায় ও অসমীয়া ভাষায় এ প্রকার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। রাঢ়ের কথ্য ভাষায় ও আধুনিক বাংলা ভাষায় নাস্তিবাচক "না" ক্রিয়ার পরে আসে। বিভিন্ন চর্যায় সপ্তমী বিভক্তিতে "ত" চিহ্নের ব্যবহার রয়েছে। এরকম ব্যবহার পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে... পণ্ডিতেরা মনে করেন চর্যাপদের ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার লক্ষণ অধিকতর স্পষ্ট।'[২১৬]

চর্যা কোনো একক অঞ্চলের সৃষ্টি নয়

চর্যার পদগুলো একই সময়ে বা একই অঞ্চলে লেখা হয়নি। এই কথা প্রথম বলেছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। তিনি মনে

---

২১৩. Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language*. p. 117

২১৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৪৮

২১৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭১

২১৬. মৃণাল নাথ, *চর্যাপদ : ভাষা পাঠ রূপান্তর*, পৃ. ২৮

করতেন—চর্যা হলো বিভিন্ন জায়গার ভাষা ও শব্দের এলোমেলো মিশ্রণ। পরবর্তীকালের গবেষণা থেকেও দেখা যায়, চর্যাগীতি লেখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। কবিদের মধ্যে কালের তফাত ছিল প্রকট। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সময়কালের ব্যবধান তো আছেই, পাশাপাশি তিন-চার প্রজন্মের ব্যবধান থাকাও 'বিচিত্র নয়' বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক সেন।[২১৭] একই মত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তমোনাশ চন্দ্রের। চন্দ্র জানাচ্ছেন: 'সিদ্ধাচার্য্যগণ সকলেই এক সময়ের ব্যক্তি নহেন।'[২১৮]

চর্যাপদ ছিল মহাযানপন্থি উপশাখা বজ্রী-সহজিয়া তান্ত্রিকদের চর্চার বিষয়। এগুলো দিয়ে তাঁরা ভজন গাইতেন, সাধনা করতেন।[২১৯] এগুলোর রচয়িতারা যে চর্যার ভাষাতেই কথা বলতেন, এটা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন সুকুমার সেন। কবিদের মুখের ভাষা এটা ছিল না। সবার বাড়িও বাংলাদেশে ছিল না। পূর্ব ভারত, নেপাল, উত্তরবঙ্গ, রাঢ়, বিহার, ওড়িশা, আসাম বা কামরূপ ইত্যাদি অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা।[২২০] লুইপার মতো সিদ্ধাচার্যদের অনেকেই ছিলেন অঘোরী সম্প্রদায়ের।[২২১] এজন্যই শাস্ত্রী মহাশয় চর্যার কবিদেরকে 'বাঙ্গালা বা তন্নিকটবর্ত্তী দেশের লোক' বলেছেন।[২২২] এঁদের কারও বাড়ি আসলেই

---

২১৭. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, পৃ. ৬

২১৮. তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৪৬

২১৯. মণিকুন্তলা হালদার, *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*, পৃ. ২৬৭

২২০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬৮-১৬৯

২২১. সেন, সৌহার্দ্য, "পৌরাণিক ইতিহাস: আঘোরী/অঘোরী (পর্ব- ১)", *দা বেংগালি মিরর*, ২৫ অক্টোবর ২০১৯

২২২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, পৃ. ৬

বঙ্গদেশে ছিল কি না, সে ব্যাপারে আন্দাজে ঢিল ছোড়া ছাড়া উপায় নেই। ড. এনামুল হকের ভাষায় : 'চর্যাপদ রচয়িতাদের মধ্যেই কেহই বাংলার অধিবাসী ছিলেন কিনা, সে-বিষয়ে অনুমান ব্যতীত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।'[২২৩]

চর্যার ভাব প্রকাশের দিক থেকেও সন্দেহ করার সুযোগ আছে। সেখানে উল্লিখিত সমাজ 'একান্তভাবে বাঙালির নয়'। 'গোটা পূর্ব-ভারতের কথাই' ঠাঁই পেয়েছে চর্যায়। আর ভারতের পূর্ব দিকে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা। সামগ্রিকভাবে এইসব অঞ্চলের আবেগ-অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করে চর্চাগীতি।[২২৪] এই রচনায় 'উঁচা উঁচা পাবত' বা টিলার ঘরের কথা বলা হয়েছে। এগুলো বাংলার ঘর নয়—বিহার-ওড়িশার প্রান্তিক অঞ্চল এবং আসামের। পদগুলোতে বলা হয়েছে হরিণ ও বুনো হাতির কথা। হাতি সহজলভ্য আসামে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে। বঙ্গ-বিহার-ওড়িশায় এই হাতি মেলা ভার। কেউ কেউ অবশ্য 'বঙ্গালী ভইলী' কিংবা 'বঙ্গালদেশ লোড়িউ' থেকে চর্যার সমাজকে বঙ্গীয় সমাজের সাথে মেলাতে চেয়েছেন। কিন্তু এই পদগুলো আক্ষরিক অর্থে 'অবাঙালির বাঙালি হওয়া' ও 'বাংলাদেশ লুট করা' অর্থ বোঝায়। তাই 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গাল' শব্দ দেখেই একে বাংলার রচনা বলা যৌক্তিক নয় বলেই মনে করেন পণ্ডিতগণ।[২২৫]

মোদ্দাকথা, চর্যাগীতি একক কোনো ভাষার, কোনো এক

---

২২৩. মুহম্মদ এনামুল হক, "নতুন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা", মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, পৃ. ৭৩

২২৪. আহমদ শরীফ, 'বাংলা সাহিত্যের সূচনা: চর্যাগীতি', আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫৯, ৩৬৫

২২৫. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭

অঞ্চলের সম্পদ নয়। এখানে আছে নানান অঞ্চলের, নানা মতের ও নানা রহস্যের সমাহার। আছে নানা প্রশ্নের জট। চর্যাগীতির ভাষাও প্রশ্নাতীত বাংলা নয়। এখানে সওয়াল ওঠানোর বহু সুযোগ রয়েছে। সেজন্যই বোধহয় *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*-এর দুটি সংস্করণ দীনেশচন্দ্র সেনের জীবিতকালে প্রকাশিত হলেও চর্যাপদকে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেননি।[২২৬] অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত *বাংলা কাব্যপরিচয়* (১৯৩৭) গ্রন্থেও স্থান পায়নি চর্যাপদ।

'বাঙালি বিদ্বানরা আজ পর্যন্তও চর্যার ভাষা-বিতর্ক সম্পর্কে সব প্রশ্নের, দ্বিধার, সংশয়ের ও অনিশ্চয়তার ইতি ঘটাতে পারেননি।'[২২৭] তাই চর্যাপদ-কেন্দ্রিক বিতর্ক ধামাচাপা দিয়ে রাখা যাবে না হয়তো। জাতীয়তাবাদীরা যতই চেষ্টা করুক, সচেতন বাঙালিরা এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেই!

অমীমাংসিত মীমাংসা

আসলে শাস্ত্রী নিজেই চর্যার ওপর বাংলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দাবির পথ খুলে দিয়েছেন। তিনি নিজে বলেছেন, তিনজন চর্যাকারের ভাষা বাংলা নয়। সুকুমার সেন চর্যার ওপর ওড়িয়া ও অসমিয়ার দাবিকে উপেক্ষা করেননি। তিনি বরং স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'ওড়িয়া বাঙ্গালা ও অসমীয়া এক মূল পূর্বপ্রান্তীয় কথ্যভাষা হইতে উদ্ভূত' বিধায় 'তিনটি ভাষার মধ্যে মিল থাকিবেই'। সেন মেনে নেন—'কোন কোন বিষয় স্বতন্ত্রভাবে ধরিলে চর্যাগীতির ভাষাকে

---

২২৬. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, চর্যাপদের ভাষা-বিতর্ক: একটি পর্যালোচনা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা: ৯৭, জুন ২০১৮

২২৭. আহমদ শরীফ, 'বাংলা সাহিত্যের সূচনা: চর্যাগীতি', আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭

প্রাচীন ওড়িয়া বা প্রাচীন অসমীয়া বলিলেও অন্যায় হয় না।[২২৮] আর সুনীতি বাবুর মত তো আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। তাঁর মতে, অসমিয়া-ওড়িয়া-মৈথিলী ও বাংলা এসেছে একই জায়গা থেকে। তা ছাড়া চর্যার ওপর মৈথিলীর প্রভাব তিনি স্বীকারও করেছেন।[২২৯] অপরদিকে অসমিয়া-ওড়িয়া-মৈথিলীর পাশাপাশি মগহি ও ভোজপুরিয়ার সাথেও সম্পর্ক রয়েছে বাংলার। কেননা এগুলোও জন্মেছিল মাগধী অপভ্রংশের অন্য দুটি শাখা থেকে।[২৩০] চর্যাপদ রচনার সময় 'বাঙলা, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া এইসব ভাষা পরস্পরের খুবই সন্নিকটে ছিল'। এদের কেউই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করেনি।[২৩১] মিলেমিশে একাকার ছিল মায়ের পেটে। বাংলা বটেই, অন্যদেরও পৃথক অস্তিত্ব দাঁড়ায়নি, পৃথক অধিকার দাঁড়ায়নি। সেনের ভাষায় :

> উড়িয়া-অসমীয়ার সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট। আদিতে এই তিনটি একই ভাষা ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে মূল ধারা হইতে উড়িয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।... ষোড়শ শতাব্দীর পরে অসমীয়া বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালার কামরূপী উপভাষা হইতে অসমীয়ার পার্থক্য খুব বেশি নয়।[২৩২]

---

২২৮. সুকুমার সেন, *বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস*, পৃ. ৫৫, উদ্ধৃত: সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

২২৯. Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language*, p. 117

২৩০. হুমায়ুন আজাদ, *কতো নদী সরোবর*, পৃ. ১৪

২৩১. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*, প্রথম খণ্ড, ১৯-২০; মুহম্মদ এনামুল হক, 'নতুন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা', মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

২৩২. সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১২১-১২২

A History of Maithili Literature (১৯৪৯) গ্রন্থে জয়কান্ত মিশ্রও স্বীকার করেছেন—'ancient Bengali and ancient Maithili had practically no difference.'[২৩৩] একইভাবে মৈথিলীর সঙ্গে অসমিয়া ও ওড়িয়ার নিকট সম্পর্কও বর্ণনা করেছেন তিনি। এ ছাড়া নির্মল দাশ, সুখময় মুখোপাধ্যায়, ড. খগেশ্বর মহাপাত্র, সুভদ্র ঝাঁ, মৃণাল নাথ প্রমুখও বলেছেন একই কথা। তাঁদের মত সামনে রাখলে বোঝা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে ওড়িয়া ভাষা আলাদা হয় বাংলা থেকে। আর ষোড়শ শতাব্দীর পর আলাদা হয় অসমিয়া। এরপর বাংলা তার নিজস্ব রূপ ধারণ করে। তার মানে, ষোড়শ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব ছিল না বাংলা ভাষার।[২৩৪] 'যেকালে এই চর্যাগুলো রচিত হয়েছিলো, তখনো বাংলা ভাষা বলে কোনো ভাষা তৈরি হয়নি।'[২৩৫] এমনকি অসমিয়া-ওড়িয়া কিংবা বাংলা 'ভাষার আলাদা করে বিকাশ হয় নি'।[২৩৬]

তাহলে একটা প্রশ্ন কিন্তু আপনা-আপনিই চলে আসে—ষোড়শ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত যেখানে বাংলার পৃথক সত্তাই তৈরি হয়নি, সেখানে দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত চর্যাকে সেই ভাষার একক সম্পদ দাবি করাটা গোঁয়ারতুমি নয় কি? চর্যাগীতি 'দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই লেখা'—এই উক্তির দ্বারা তো অন্যান্য ভাষার দাবিকে স্বীকার করে নেওয়াই হলো।[২৩৭] কাজেই আবার পৃথকভাবে বাংলার দাবি ওঠানোর মানে কী? পাণ্ডিত্যের অপচয়?

---

২৩৩. Jayakanta, *A History of Maithili Literature*, p. 49

২৩৪. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, পৃ. ২৬৮

২৩৫. প্রাগুক্ত

২৩৬. মৃণাল নাথ, *চর্যাপদ : ভাষা পাঠ রূপান্তর*, পৃ. ৩৩-৩৪

২৩৭. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ৩

চর্যাপদকে বাংলার একক সম্পদ বলাটা হাস্যকর বিষয়। হিন্দি কিংবা কুড়মালির দাবি আপনি হয়তো দুর্বল বলতে পারবেন। কেননা হিন্দি কিংবা কুড়মালির চেয়ে 'চর্য্যাপদগুলির সহিত প্রাচীন মৈথিলী ও পূর্ব্ব-বিহারের ভাষা, প্রাচীন ওড়িয়া ভাষা এবং প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার সাদৃশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।'[২৩৮] আর এদের প্রত্যেকেরই দলিল শক্তিশালী। কেননা, 'শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত চর্যাগানগুলি যখন লেখা হচ্ছিল ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমিয়া এবং বাংলা ঐতিহাসিকভাবে তখনও স্বাধীন ভাষা-সত্তা অর্জন করে নি।... চর্যাগুলি লেখা হয়েছিল এইসব ভাষার স্বাধীন সত্তা অর্জনের আগে।'[২৩৯] অপর দিকে ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমিয়া এবং বাংলা এই চারটি ভাষাই 'মাগধী অপভ্রংশ' থেকে বিকশিত। তাই এদের মধ্যে 'প্রত্ন-ঔপভাষিক' সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করেন পণ্ডিতরা। এই 'দাবি বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যের দিক থেকেও সমর্থিত।'[২৪০]

এসব বুঝতে পেরেই বিদগ্ধ ভাষা-পণ্ডিতরা চর্যার ভাষাকে ডেকেছেন 'প্রোটো-বাংলা', 'প্রোটো-মৈথিলী', 'প্রোটো-আসামি', 'বঙ্গ-কামরূপী', 'অবহট্‌ঠ', 'অপভ্রংশ' ইত্যাদি নামে। অর্থাৎ, চর্যাগীতি ঠিক অরিজিনাল বাংলা, মৈথিলী বা অসমিয়া নয়। অরিজিনাল রূপের ঠিক পূর্ববর্তী ধাপ। কারণ, তখনও বাংলা-মৈথিলী-অসমিয়া নামে আলাদা ভাষা জন্ম নেয়নি। তখন

---

২৩৮. তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৪৬

২৩৯. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ৩১

২৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

ছিল পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ[২৪১] (অবহট্‌ঠ) ইত্যাদি নামে।[২৪২] সুকুমার সেন বলেন,

> আটপহরিয়া অর্থাৎ ঘরোয়া ভাষা ছিল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত ভাষা।... এই প্রাকৃত ভাষা ভাঙ্গিয়া আবার বিভিন্ন আধুনিক ভাষা—যেমন বাঙ্গালা, আসামী, ওড়িয়া, মৈথিলী... উৎপন্ন হইয়াছে।[২৪৩]

কাজেই শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত চর্যাগীতিকে বাংলা ভাষার একক সম্পদ বলা যায় না। বরং এর মধ্যে 'নিহিত ছিল পরবর্তীকালের বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী ও অসমিয়ার বীজ।'[২৪৪] আর বাংলা তখনো ছিল ভ্রূণ অবস্থায়। যদিও সুকুমার সেন তখনকার বাংলাকে 'নবজাতক শিশু'[২৪৫] বলতে চেয়েছেন, কিন্তু সেটা আসলে সঠিক নয়। এটা সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে বাংলার 'বীজ', যেমনটা বলেছেন নির্মল দাশ :

> তখন পূর্বভারতে মাগধী অপভ্রংশ থেকে নব্যভারতীয় আর্যভাষার একটি পূর্বী শাখার বিকাশ ঘটেছে, যার কোন গোত্রনাম স্থিরীকৃত হয় নি, যা শুধু কথ্য ভাষা হিসাবে পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচলিত ছিল। ভাষাতত্ত্বের পরিভাষায় এর নাম দেওয়া যেতে পারে প্রত্ন-মগধীয় নব্যভারতীয় আর্যভাষা (Proto Magadhan New Indo-

---

২৪১. বাংলার ঠিক আগের রূপকে শহীদুল্লাহ্ অবশ্য 'গৌড় অপভ্রংশ', আর এর পূর্বের ধাপকে গৌড় প্রাকৃত বলেছেন। [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১৮]

২৪২. মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৩

২৪৩. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা*, পৃ. ২-৩

২৪৪. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ৩৩

২৪৫. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৩৫

Aryan)। এই প্রত্ন-ভাষা পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যবহৃত হত বলে এদের নানা আঞ্চলিক রূপভেদ বা উপভাষাও ছিল, এই উপভাষাগুলি কালক্রমে অনুরূপ পরিস্থিতির অবকাশে উড়িষ্যা এলাকায় ওড়িয়া, উত্তর-পূর্ববিহারে মৈথিলী, উত্তর-পূর্ববঙ্গে অসমিয়া এবং বঙ্গদেশে বাংলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত চর্যাগুলি লেখা হয়েছিল এইসব ভাষার স্বাধীন সত্তা অর্জনের আগে অর্থাৎ এই সব ভাষা যখন বীজ-ভাষা রূপে প্রত্ন-মগধীয় নব্য ভারতীয় আর্যভাষার আঞ্চলিক উপভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল।[২৪৬]

'যে সাধারণ ভাষা থেকে বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া ও হিন্দী ভাষার উদ্ভব হয়েছে, চর্যাগীতিগুলি সেই ভাষায় লেখা।'[২৪৭] স্বীকার করতেই হবে—চর্যা 'বাংলাসহ অনেকগুলো ভাষার সাধারণ সম্পত্তি।'[২৪৮] তাই সুখময় মুখোপাধ্যায় উপসংহার টেনে বলেন—'চর্যাগীতিগুলির ভাষাকে বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া, মৈথিলী ও হিন্দী ভাষার সাধারণ জননী বলে স্বীকার করলে সব সমস্যারই সমাধান হয়।'[২৪৯]

ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া সম্পদের মতো চর্যাকে স্রেফ নিজের করে নেওয়ার সুযোগ নেই আসলে। বাংলাভাষী পণ্ডিতরা যদি একে নিজেদের একক সম্পত্তি বলে যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকেন, তবে ওড়িয়া, বিহারি ও অসমিয়ারাও হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন

---

২৪৬. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ৩১

২৪৭. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ২

২৪৮. মোহাম্মদ আজম, *তথ্য, সত্য ও ইতিহাস*, পৃ. ২

২৪৯. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ৩

না হয়তো। তাঁরা ভাষাতাত্ত্বিক শক্তপোক্ত যুক্তি দিয়ে বলবেন: 'যেকালে এই চর্যাগুলো রচিত হয়েছিলো, তখনো বাংলা ভাষা বলে কোনো ভাষা তৈরি হয়নি।'[২৫০] তাই চর্যাকে বাংলার একক সম্পদ দাবি না করে, অন্যান্য ভাষার প্রাপ্য অধিকার স্বীকার করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এতে করে সময় ও মেধা—দুটোরই সাশ্রয় হবে। অবশ্য আবেগী বাঙালিরা হয়তো হাল ছাড়বে না। তাঁরা 'চিরকাল চর্যাগীতিকে আদি বাংলারূপে জানবে ও মানবে', অপর দিকে 'উড়িষ্যা-বিহার-আসামও কখনো তাদের দাবি ছাড়বে না।'[২৫১]

---

২৫০. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, পৃ. ২৬৮

২৫১. আহমদ শরীফ, 'বাংলা সাহিত্যের সূচনা: চর্যাগীতি', আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫৯

০৪

চর্যার কবিরা বাংলা-ছাড়া হলেন যেভাবে

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[২৫২], গোপাল হালদার[২৫৩], অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[২৫৪], নির্মল দাশ[২৫৫] প্রমুখ যখন ইতিহাস বয়ান করেছেন, পুরো দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন মুসলিমদের ওপর। তুর্কিদের অত্যাচারের কারণেই নাকি চর্যার রচয়িতারা বাংলা-ছাড়া হয়েছিলেন! এই ব্যাপারে অনেক বেশি কড়া বক্তব্য দিয়েছেন বোধহয় গোপাল হালদার :

> তুর্ক আক্রমণের ফলে বিহারে ও মধ্যপশ্চিম বাঙ্গালায় চলল ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা। তুর্করা নিজেরা ছিল দুর্ধর্ষ, ভয়ঙ্কর জাতি। ইসলাম গ্রহণ করায় তাদের নৃশংসতা ও ধ্বংস-প্রবৃত্তি নতুন ধর্মোন্মাদনার বশে আরও উগ্র হয়ে উঠেছিল।... প্রথম দিকে যেখানেই তারা বিজয়ী হয়েছিল সেখানেই তারা রক্তে ও আগুনে প্রাচীন সংস্কৃতির চিহ্ন বিলুপ্ত করতে দ্বিধাবোধ করে নি।[২৫৬]

---

২৫২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪

২৫৩. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০

২৫৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫৭

২৫৫. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ২৮

২৫৬. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬

হালদারের মতে, বাংলা বিজয়ের ফলে রাজা লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। "তাঁর সাথে বহু রাজপুরুষ ও বিদ্বজ্জনও তাঁর সহগামী হন। আরও অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ থেকেও অনেকে চলে যান 'উদ্বাস্তু' হয়ে কামতা-কামরূপ অঞ্চলে। এ সব অঞ্চলে তাই প্রাচীন বাঙলার শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা কতকাংশে রক্ষা পেয়েছিল। এমন কি, নেপাল থেকে বাঙলার সেই ধারা হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে এবং চীনেও পৌঁছেছিল।"[২৫৫] এভাবেই নাকি বাংলার সম্পদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে নেপাল, তিব্বত ও চীনে।

আমরা এই অধ্যায়ে দেখার চেষ্টা করব, চর্যা ও চর্যার কবিরা বাংলা-ছাড়া হওয়ার আসল কারণ কী কী। এটা কি মুসলিম-বিজেতাদের 'ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা'র ফল, যেমনটা হালদার বলেছেন? নাকি এর ভেতর অন্য কোনো 'কারণ' লুকিয়ে আছে?

চর্যার সমকালীন শাসকগোষ্ঠী

তেইশ জন বৌদ্ধ সাধু মিলে রচনা করেছিলেন চর্যার গানগুলো। সাধুদের নামগুলো বড়ই অদ্ভুত—কাহ্নপা, লুইপা, কুক্কুরীপা, ঢেণ্ঢণপা, ভুসুকুপা, সরহপা, শবরপা...।[২৫৮] অধিকাংশই তাঁদের ছদ্মনাম। 'নামের সঙ্গে পা-এর উল্লেখে বোঝা যায় যে এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত পদকর্তা ভণিতায় নিজের নাম গোপন করে গুরুর নাম উল্লেখ করেছেন।'[২৫৯] চর্যার লেখকগণ নিজের আসল নাম উল্লেখ করেননি। এখানেও তাঁরা একটা রহস্য সৃষ্টি করে

---

২৫৭. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫

২৫৮. হুমায়ুন আজাদ, *কতো নদী সরোবর*, পৃ. ১৮

২৫৯. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ২১

রেখেছেন। চর্যার ভাষার মতোই কবিদের নামগুলোও রহস্যময়।

এখন হয়তো মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন জাগতে পারে: কেন চর্যার কবিরা গোপন করলেন তাঁদের নামগুলো? কেন গানগুলোকে রচনা করা হলো রহস্যঘেরা ভাষায়?

এর উত্তর পেতে হলে জানতে হবে সমকালীন পরিবেশের কথা। আমরা দেখেছি, চর্যার আনুমানিক রচনাকাল হিসেবে ধরা হয় ৯৫০-১২০০ সালকে। এই সময়েই প্রাচীন বাংলায় পতন হয় পাল বংশের এবং ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা পায় সেনবংশ (১০৯৭-১২২৫ খ্রি.)।[২৬০] ড. নির্মল দাশ বলেন,

> চর্যাগীতিগুলিতে সেকালের সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতির কিছু কিছু আভাস আছে। যে সময়ে এই গানগুলি রচিত হয়েছিল সে সময়ে বাংলাদেশে সেন-বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত।[২৬১]

'ধর্মে কর্মে আচারে ব্যবহারে বিবিধ বিধিনিষেধে চর্যাপদের সমকালীন বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য।'[২৬২] আর সেই আধিপত্যবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সমকালীন সেন শাসকগোষ্ঠী। তাঁরা কর্ণাট থেকে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে।[২৬৩] আধুনিক মহীশূর, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কানাড়ি ভাষাভাষি অঞ্চলকে তাঁদের আদি

---

২৬০. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পৃ. ২০

২৬১. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ৯৮

২৬২. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পৃ. ৩৪

২৬৩. আবদুল মমেন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৯৪

নিবাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[২৬৪] তাঁরা ছিল অবাঙালি।[২৬৫]

সেনদের মধ্যে প্রথম যাঁর কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তিনি হলেন সামন্তসেন।[২৬৬] 'সামন্তসেনের পুত্রের নাম হেমন্তসেন।'[২৬৭] তিনি 'কোন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না'।[২৬৮] এই হেমন্তের ঔরসে জন্ম নেয় বিজয় সেন। 'খুব সম্ভবত নিড়োলে সামন্তরাজা হিসাবে বিজয়সেনের উত্থান শুরু হয়। উত্তর বাংলার সীমান্ত বিদ্রোহের সময় তিনি শক্তি বৃদ্ধি আরম্ভ করেন।... তিনি সুযোগের সন্ধানে থাকেন।'[২৬৯] রাজা মদন পালের মৃত্যুর পর তাঁর সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ চলে আসে। 'মদন পাল মারা গেলে বিজয়সেন অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজকুমারদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন।'[২৭০] বিজয়সেন সুদীর্ঘ ৬২ বছর (১০৯৮-১১৬০ খ্রি.) রাজত্ব করেন। তাঁর হাত ধরেই বাংলায় সেন শাসনের উপনিবেশ মজবুত হয়।[২৭১] বিজয়সেনের পর রাজা হন তাঁর পুত্র বল্লালসেন। বল্লালসেন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণ সেনের ওপর রাজ্যভার অর্পণ করে সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে ত্রিবেণীর নিকটবর্তী একটি স্থানে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। '১১১০ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন গৌড়সিংহাসনে আরোহণ

২৬৪. *বাংলাপিডিয়া*, সেন বংশ, https: bn.banglapedia.org index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8_%E0%A6%AC%E0%A6%82%E0%A6%B6

২৬৫. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস* (আদি পর্ব), পৃ. ৪১৭

২৬৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৮

২৬৭. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩১৫

২৬৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫

২৬৯. আবদুল মমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৫

২৭০. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ৭১

২৭১. আবদুল মমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৭

করিয়াছিলেন।'[২৭২] তাঁর শাসনামলের শেষ দিকে এসে রাজ্য পরিচালনায় নিস্তেজ হয়ে পড়েন। এই সময় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও সংহতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কতগুলি বিদ্রোহী প্রধানের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ায় সেন সাম্রাজ্যে চিড় ধরে। এরপর তেরো শতকে সেন রাজত্বের ওপর মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭৩]

এবার মূল কথায় আসি। চর্যা যখন রচিত হচ্ছিল, সেই সময়ে প্রাচীন বঙ্গ ও রাঢ়ের শাসনকর্তা ছিল সেনরা। সাম্প্রদায়িক লেখকদের মতে যদি আমরা ধরেও নিই যে, চর্যা দেশান্তরী হওয়ার জন্যে মুসলিম শাসকরা দায়ী, এর পরেও কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—সমকালীন সেনরা কি চর্যা লেখায় সাহায্য করেছিল?

এককথায় এর উত্তর হবে—না। কারণ 'বৌদ্ধ চর্যাপদ ব্রাহ্মণ্য-আদর্শ-বিরোধী।'[২৭৪] তাই ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের সাহায্য করার প্রশ্নই আসে না। বরং এর উলটোটাই দেখা যায়। তাই তো ভয়ে ভয়ে, জীবন বাজি রেখে কবিরা লিখেছেন চর্যাপদ। গোপন করেছেন নিজেদের নাম-পরিচয়—যেন সেনদের হাতে অকালে নিজের জীবন দিতে না হয়। অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য অবশ্য এর সাথে আরও কিছু পয়েন্ট যুক্ত করতে চান :

> চর্যাপদের মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরা হিন্দুদের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি ব্যঙ্গ করিতে ও হিন্দু আচারকে ঘৃণা করিতে দ্বিধা করেন নাই। কাজেই স্ব-সম্প্রদায়ের বাহিরে

২৭২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২০-৩২৩

২৭৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব), পৃ. ৪১৭

২৭৪. তারাপদ ভট্টাচার্য, *বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস* (প্রাচীন পর্ব), পৃ. ৩৫-৩৬

> চর্যার প্রচার নিরাপদ নহে, এইজন্য চর্যা রহস্যায়িত। চর্যাপদের অর্থকে নিগূঢ় রাখার অপর কারণ হইতেছে—চর্যায় ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি প্রতীকের বাহ্য অর্থ ভদ্রতা ও শালীনতার বিরোধী। অধ্যাত্ম সাধনার অতীন্দ্রিয় আনন্দকে চর্যা কবিরা শারীর যৌন-বিলাসের চিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়াছেন।... চর্যার ভাষা সুস্পষ্ট হইলে গোষ্ঠীবহির্ভূত ও স্থূল-অর্থ-প্রিয় সাধারণের কাছে বহু পদ অশ্লীল নেড়া-নেড়ির কাণ্ড বলিয়া ঘৃণিত হইবার আশঙ্কা ছিল। কাজেই চর্যাকারগণ ইচ্ছা করিয়াই চর্যার মধ্যে মধ্যে এমন ভাবে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে কেবল গোষ্ঠীগত প্রতীকজ্ঞ লোকেরাই বুঝিতে পারে।[২৭৫]

ভট্টাচার্য মহাশয় প্রধানত দুটো কারণের দিকে ঝুঁকেছেন :

- ১. বৌদ্ধদের রচিত চর্যাপদ ছিল হিন্দু আদর্শের পরিপন্থি। অপরদিকে বৌদ্ধ সাধকেরাও হিন্দুদের শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ড ভালো চোখে দেখত না। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল দা-কুমড়া সম্পর্ক। চর্যাপদের কবিতায় এর প্রতিফলন রয়েছে। এজন্যই হিন্দু শাসকগোষ্ঠীর ভয়ে বৌদ্ধরা চর্যাকে করেছে রহস্যমণ্ডিত—যাতে নির্দিষ্ট লোক ছাড়া এর মর্ম কেউ বুঝতে না পারে।
- ২. চর্যাপদে কিছুটা অশ্লীল জিনিস রয়েছে, যা ভদ্রতা ও শালীনতার খেলাফ। সেখানে আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডকে উপস্থাপন করা হয়েছে যৌনতার মাধ্যমে। কাজেই চর্যার ভাষাকে যদি সুস্পষ্ট রাখা হতো, তাহলে জনসাধারণের কাছে ঘৃণিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই কারণে চর্যার

---

২৭৫. প্রাগুক্ত

কবিরা ইচ্ছে করেই দুর্বোধ্য করে রেখেছেন ভাষাকে যাতে তাঁদের শিষ্যরাই কেবল সেটার মর্ম অনুধাবন করতে পারে।

তারাপদ বাবুর উত্থাপিত দ্বিতীয় কৈফিয়তটা খুবই হাস্যকর। তিনি অশ্লীলতার ধোঁয়া তুলে চর্যাকে রহস্যময় রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন, অথচ ভুলে যাচ্ছেন যে, ওই সময়ে খোদ মন্দিরে মন্দিরে ছিল অশ্লীলতার জয়জয়কার। চর্যাপদের সমসাময়িক হিন্দুসমাজ যৌনতা দিয়ে ভরপুর ছিল। উলঙ্গ মূর্তি দিয়ে ভরে দিয়েছিল মন্দিরের পুরো দেয়াল। খোদ ধর্মগুরুদের জন্য বরাদ্দ ছিল অসংখ্য যৌনদাসী। বিশেষ করে চোলযুগের কথা (৩০০ খ্রি.পূ.-১২৭৯) এখানে উল্লেখ করা যায়। রোমিলা থাপার বলেন,

> চোলযুগের অধিকাংশ মন্দিরে দেবদাসীদের দেখা যেত। এই প্রথার প্রথমদিকে দেবদাসীরা ছিল বিশেষ শ্রদ্ধেয়া পরিচারিকা। রোমের কুমারী কন্যাদের মতো এখানকার দেবদাসীদেরকেও খুব অল্প বয়সে মন্দিরের জন্যে উৎসর্গ করে দেওয়া হতো।... শেষপর্যন্ত অনেক মন্দিরেই দেবদাসীরা বারবণিতায় রূপান্তরিত হলো। আর্থিকভাবে অত্যাচারিত এই নারীদের অর্জিত অর্থ মন্দির-পরিচালকদের কাছে জমা পড়ত।[২৩]

অবৈধ কামচর্চা তখনকার হিন্দু-সমাজে ছিল খুবই সহজলভ্য বিষয়। সমাজের উঁচুস্তরের লোকেরা অবৈধ যৌনতার পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিলেন। মন্দিরের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল এগুলোর অন্যতম কেন্দ্র। কাজেই, এগুলোকে বিবেচনায় নিলে আসল রহস্যটা আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে। আমরা এখন সেই

---

২৩. রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ ১৮১

আলোচনার দিকেই এগোব।

সমকালীন রাজ-দরবারে অশ্লীলতার মাত্রা

তৎকালীন হিন্দুস্তান ছিল অশ্লীলতায় ভরপুর। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে এর প্রভাব ছিল আরও বেশি। খাজুরাহো (Khajuraho) মন্দির কমপ্লেক্স যৌনতার এক জলজ্যান্ত উদাহরণ। এটা যৌন-ভাস্কর্যের জন্য প্রসিদ্ধ।[২৭৭] এটি রাজপুত বংশোদ্ভূত চন্দেল রাজবংশের অধীনে ৯৫০ ও ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত (পণ্ডিতদের আন্দাজ-মতে, এই সময়টাতেই চর্যাপদ লেখা হচ্ছিল)।[২৭৮] এর বাইরে আরও অসংখ্য মন্দির রয়েছে, যেগুলোতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য যৌনমূর্তি। ওড়িশা রাজ্যের কোণার্ক সূর্য মন্দির, রাজস্থানের জগদীশ মন্দির, মহারাষ্ট্রের মারকান্ডা মন্দির-সহ আরও ডজনখানিক উদাহরণ দেওয়া যাবে।[২৭৯]

এবার চর্যাপদের সমকালীন সেন-দরবারের দিকে তাকানো যাক। চর্যাপদের নিকটবর্তী রাজা হিসেবে বল্লালসেন (১০৮৩-১১৭৯) ও লক্ষণ সেনের (১১৭৮-১২০৬) কথা বলা যায়। তাঁদের আমলে বেশ কুরুচিপূর্ণ কবিতার চর্চা হতো—তাও আবার ভরা মজলিসে। রাজ-কর্মচারীরা ডুবে ছিল 'শৃঙ্গারপ্রবাহে',[২৮০]

---

২৭৭. Philip Wilkinson, *India: People, Place, Culture and History*, p. 352-35

২৭৮. Madan Gopal, *India through the ages*, p. 179

২৭৯. Rutu Ladage, 14 Temples In India Where You Get A Lot More Than Just The Traditional Prasad, indiatimes.com/culture/who-we-are/14-temples-in-india- where-you-get-a-lot-more-than-just-the-traditional-prasad-231878.html

২৮০. 'শৃঙ্গারপ্রবাহ' মানে : নায়ক-নায়িকার সম্ভোগমূলক রস, আদিরস, মৈথুন, স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গম ইত্যাদি। দ্র. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. ১০৮৭

সাথে সাথে রাজা-বাদশাহরাও। তাঁরাই এসবের অর্থায়ন করত। বাইজি-নাচ ছিল সে সময়ের খুব প্রসিদ্ধ ঘটনা। আর ব্যভিচারের কথা তো বলাই বাহুল্য। উচ্চ বর্ণের লোকেরা সবাই বারবনিতা পালত ঘরে। এটা ছিল সে সময়কার যুগধর্ম।[২৮১] 'রাজসভায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এবং নানা প্রকারের কামকল্পনা-ভাবনাকে আশ্রয় করিয়া প্রতি সন্ধায় বাররামাদের [নটীদের] নৃত্যগীত হইত, এবং নবদ্বীপকৃষ্ণ লক্ষ্মণসেন পাত্রমিত্রদের লইয়া সেই নৃত্যগীত উপভোগ করিতেন।'[২৮২] এর বাইরে সেখানে চলত অশ্লীল কাব্যের আসর। সভাকবিদের প্রতিভা ব্যয় হতো এসব কুৎসিত কবিতা লেখার পেছনে। এর জন্য বহুত এনাম পেতেন তাঁরা। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) জানাচ্ছেন :

> আসল কথা, এই পর্বের বাঙলাদেশে রাজসভায়, সামন্ত-সভায়, উচ্চতর সম্প্রদায়গুলির বহির্বাটিতে, এক কথা উচ্চকোটি সমাজের সামাজিক আবহাওয়াটাই এই ধরনের।... শ্রীহর্ষের নৈষধ-চরিত বা ধোয়ীর পবনদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা গোবর্ধনের সপ্তশতী সর্বত্রই যেন শৃঙ্গার রসের প্রাবল্য একটু বেশি... সেন-রাজসভায় এবং সমসাময়িক অভিজাত স্তরে সেই রসই কামদোহনে মদ্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।'[২৮৩]

তৎকালীন আবহাওয়াই ছিল কুরুচিপূর্ণ। লক্ষ্মণ সেনের এক রক্ষিতার দাপট ছিল খুব বেশি। স্বয়ং রাজা তার কথায় উঠবস করতেন। এটা মন্ত্রীদের কাছে ভালো ঠেকত না। তাঁরা

---

২৮১. সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা*, পৃ. ৭৬-৭৭

২৮২. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব), পৃ. ৬২৭

২৮৩. প্রাগুক্ত

প্রতিবাদ জানাতেন। কিন্তু লক্ষ্মণ ওই যৌনকর্মীর প্রেমে এতটাই পাগলপারা ছিলেন যে, কারও কথাই কানে তুলতেন না। এটা নিয়ে মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে টানাপোড়েন লেগে ছিল তাঁর। রাজদরবারে প্রকাশ্যে চলছিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। এর মূলে ছিল 'লক্ষ্মণের উপপত্নী নিচুজাতীয়া বল্লভা। মহারাজাদের যে বহু উপপত্নী ছিল তাতে সন্দেহ নেই, তার মধ্যে প্রধান নীচকুল-জাতা এই মহিলাটি; এর দাপট ও লক্ষ্মণের উপর এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ প্রভাবকে চরম হেয় চোখে দেখতেন... লক্ষ্মণ সেনের ছিল বহু উপপত্নী; শুধু রাজার নয় তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পরিবারেও এ নিয়ম ছিল যুগধর্ম হিসাবে।... নিচুজাতীয়া বল্লভার ব্যবহার ব্রাহ্মণ-সমাজের চোখে ছিল অবমাননাকর। তাঁরা রাজার এই অপ্রীতিকর উপপত্নী-অনুরক্তির ফলে নদীয়া বা বিজয়নগর ছেড়ে অন্যত্র যেতে শুরু করলেন।'[২৮৪]

মানবকল্যাণকে ধর্ম না বানিয়ে যুগধর্ম বানানো হয়েছিল বারবনিতার পূজাকে। আদিম বাংলা ও বাংলার সমাজের দিকে কোনো নজর ছিল না এই বুড়ো শাসনকর্তার। তিনি মত্ত ছিলেন রক্ষিতা, বাইজি, আর শৃঙ্গার-কাব্য নিয়ে। এই রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজের উচ্চবিত্তদের স্তরেও। সভাকবি জয়দেবের স্ত্রীও 'বিবাহপূর্ব জীবনে একজন নটী ছিলেন।'[২৮৫] উঁচু বর্ণের লোকেদের ঘরে ছিল বহুসংখ্যক উপপত্নী বা রক্ষিতা। হিন্দু ঐতিহাসিকগণ অনেক চেষ্টা করেও এই সত্য লুকাতে পারেননি। এমনকি সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্রাহ্মণ্যবাদী লোকও এটা স্বীকার করে নিয়েছেন :

---

২৮৪. সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা*, পৃ. ৭৬-৭৭

২৮৫. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : সেনযুগ*, পৃ. ৬৮

> রামপালের সঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের চরিত্রের তুলনা করলে, একাদশ ও দ্বাদশ শতকের বাঙালী সমাজের একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। সে-যুগে অশীতিপর বৃদ্ধ নৃপতি তখনো শৃঙ্গারানুরক্ত, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা নিখুঁত শৃঙ্গার-কাব্য রচয়িতা, ঘরে ঘরে ব্যভিচার ও নৃত্যগীতের অর্থাৎ তথাকথিত 'আর্টে'র পর্যাপ্ত সমাবেশ, নির্যাতিত বণিক্-সমাজ বহির্বাণিজ্যে পরান্মুখ, তাদের কেহ দেশত্যাগী, কেহ শৃঙ্গার-ধর্মীতে পর্যবসিত, সংকীর্ণ জাতিভেদ-প্রথা যে যুগে ধর্ম-সংস্কারের ভিত্তি, সে-যুগের বাঙালী সমাজ যে একাধারে দুর্বল, আত্মবিশ্বাসহীন, অকর্মণ্য, বাক্‌সর্বস্ব ও দেশের স্বাধীনতা-রক্ষায় অসমর্থ হবে তাতে আর সন্দেহ কি?[২৮৬]

অবাধ যৌনতা, ব্যভিচার, বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্ক—এগুলোর ছড়াছড়ি ছিল সেন রাজাদের আমলে। রাজা-বাদশাহ, উজির-নাজির সবাই জড়িয়ে পড়েছিল কামচর্চায়। এর পরেও যদি চর্যাপদ বাংলা-ছাড়া হওয়ার কারণ হিসেবে কেউ অশ্লীলতার দোহাই দেয়, তবে সেটাকে নিতান্তই ছেলেমানুষি বলতে হয়। চর্যাপদে যে ধরনের অশ্লীলতার দেখা পাওয়া যায়, তার চেয়ে কয়েকশ গুণ অশ্লীল কাব্যের চর্চা হচ্ছিল সেন-রাজাদের দরবারে। সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার বলছেন সেই ঘটনা :

> সেন রাজাদের আমলে সেই সমন্বয়-ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হলো। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ না থাকায় সেন রাজারা এই সমন্বয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা বুঝতে পারেন নি। বাংলার বাইরে থেকে এসে

---

২৮৬. সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা*, পৃ. ৭৮

> অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁরা যেমন এদেশের সিংহাসনে অধিকার স্থাপন করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই তাঁরা বাংলাদেশের সমাজজীবনেও ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থাকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফলে, পাল আমলে একটি যে সামগ্রিক বাঙালি জাতি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়ে জল- আচরণীয়-অনাচরণীয় জাতিভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর বাঙালি জাতিকে শতধা বিভক্ত ক'রে দিল, আর শতধাবিভক্ত জাতির দুর্বলতার কারণে একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে মুষ্টিমেয় তুরস্ক সেনা অবহেলাভরে রাঢ়-বঙ্গ-বরেন্দ্র ভূমিতে নতুন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজচেতনার ভিত্তি স্থাপন করতে সমর্থ হলো।[২৮৭]

এভাবেই প্রাচীন বাংলার অঞ্চলগুলো হারিয়ে গিয়েছিল এক অতল-তলে। যার মূলে ছিল সেনবংশীয় উপনিবেশবাদীরা।

ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব

তারাপদ ভট্টাচার্যের বলা প্রথম পয়েন্টটাই আসল কারণ। ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল বৌদ্ধধর্মের ঘোরতর শত্রু। হিন্দু সেন রাজারা ছিলেন কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী। তাঁরা বৌদ্ধদের সহ্য করতে পারতেন না। সেই সাথে বৌদ্ধরা যে ভাষার চর্চা (প্রোটো-বাংলা) করত, সেটাও তাঁদের কাছে ছিল চরম ঘৃণিত। সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো ভাষাচর্চা ছিল গর্হিত অপরাধ। ড. মোহর আলী বলেন,

> Whatever might be the exact date of the Charyāpads it is generelly recognized by scholars that no vernacular

---

২৮৭. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, *চর্যাগীতিকোষ*, পৃ. ৩৮-৩৯

language could have found a scope for free literary expression under the Brahmanical system which preceded the coming of the Muslims and which interdicted the study of any but the Sanskrit language.[২৮৮]

ইংরেজদের মতো তাঁরাও কলোনির ভাষাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন। তাঁদের কাছে চরম পূজনীয় ছিল সংস্কৃত ভাষা। 'সেন-রাজারা সংস্কৃতের উৎসাহদাতা ছিলেন এই জন্য যে, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, সংস্কৃতের চর্চার অর্থই হচ্ছে হিন্দু শাস্ত্রের চর্চা।... তখনকার দিনে বাংলা ভাষার সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়াদের নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। তাই সেন-রাজারা বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। রাজার অনাদরে, রাজপুরুষদের তাড়নায়, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ঘৃণায় সেনদের সময়ে বাংলা সাহিত্যের স্রোত একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।'[২৮৯]

সেনদের রাজসভায় কদর পেতেন কেবল সংস্কৃতের পণ্ডিত ও কবি-সাহিত্যিকরা। গোবর্ধন, জয়দেব, শরণ, ধোয়ী ও উমাপতিধর নামের পঞ্চরত্ন ছিল সেন দরবারে।[২৯০] কিন্তু এঁদের কারও মুখের ভাষাই সংস্কৃত ছিল না। জয়দেব উঠে এসেছিলেন (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের) বীরভূম থেকে।[২৯১] তিনি আদিম বাংলার সন্তান। প্রোটো বাংলাভাষী। সুকুমার সেনের মতে, 'সে যুগের

---

২৮৮. Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* vol. IB, p. 854

২৮৯. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৫

২৯০. আবদুল করিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ. ১৪

২৯১. ওয়াকিল আহমদ, *সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য,* পৃ. ২-৩; অবশ্য সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে তিনি উঠে এসেছিলেন ওড়িশা থেকে। [সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃ. ১৬]

শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন জয়দেব।'[২৯২] তাঁর বিখ্যাত রচনার নাম *গীতগোবিন্দম্*।[২৯৩] এটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা গীতি-কবিতা। জয়দেবের কাব্য-প্রতিভাকে মাতৃভাষায় বিকশিত হওয়ার কোনো সুযোগ দেননি লক্ষ্মণ সেন। অন্য কবিদেরও একই দশা হয়েছিল। কারণ, লক্ষ্মণ সেনের "রাজধানীতে যে সংস্কৃত ভাষা-চর্যার ও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহা জয়দেবের গীত-গোবিন্দের মাধ্যমে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করিলেও বাংলা-ভাষা চর্চার কোন আয়োজন তথায় ছিল না।"[২৯৪] ব্রাহ্মণদের কড়া নজরদারির কারণে, দেশীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২৯৫]

ভিনদেশি ভাষা সংস্কৃত চর্চা করতে বাধ্য করা হয়েছে সব কবি-সাহিত্যিককে। কেননা হিন্দু রাজত্বে দেশীয় প্রাকৃত ভাষা ছিল অচ্ছুত, অস্পৃশ্য। আর তাই 'প্রাকৃতজ বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা কেবল রুচিবিরোধী নয়, নীতিবিরোধীও'[২৯৬] ছিল তাঁদের কাছে। এজন্য বাংলার ভ্রূণ চর্যাগীতিগুলো দুমড়ে-মুচড়ে শেষ করে দিতে চেয়েছিল সেন বংশীয় হায়েনারা। এভাবেই

---

২৯২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা*, পৃ. ২

২৯৩. জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

২৯৪. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, পৃ. ১৭

২৯৫. 'সেন রাজদরবারে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল, তাঁরাই ছিলেন পণ্ডিত এবং শিক্ষিত শ্রেণী। দরবারের ভাষাও ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষায় ধর্মকেন্দ্রিক কাব্য লেখা হত, এই দেব-ভাষা বা দেব-গ্রন্থে শূদ্র বা সাধারণের কোন অধিকার ছিল না, তাছাড়া দেব-ভাষা সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের বিরুদ্ধেও ব্রাহ্মণদের কড়া নজর ছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে দেশী অ-দেব ভাষা বাংলায় কাব্য রচনার সুযোগ ছিল না।' [আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১৩২]

২৯৬. ওয়াকিল আহমদ, *সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৩

'অবাঙালি শাসক সেনদের সময় থমকে গেল সবকিছু'।[২৯৭]

সেনরা ছিল বহিরাগত।[২৯৮] তাঁরা 'গৌড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি আশ্রয়ী' ছিল।[২৯৯] সেনরা প্রাচীন বঙ্গ ও রাঢ় শাসন করেছে। কিন্তু অন্যান্য উপনিবেশবাদীর মতোই তাঁরা ভালোবাসেনি বঙ্গের জনপদকে, এই জনপদের ভাষাকে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

> বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন তো পৌরাণিক ও স্মার্ত সংস্কৃতির প্রধান বাহক ছিলেন। তবে সমস্ত রাজসামন্ত ও ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও শ্রুতিস্মৃতি লইয়া মত্ত থাকিলেও, জনসাধারণের ধর্মবোধ ও জীবন-চর্চার সহিত তাহার বিশেষ যোগ ছিল না বলিয়াই অনুমিত হয়।[৩০০]

'লক্ষণ সেনের দরবারে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের প্রভাব অত্যাধিক থাকায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবও অত্যাধিক ছিল, তাই বাংলা সাহিত্য দরবারে প্রবেশ করার অবকাশ ছিল না।'[৩০১] প্রোটো বাংলাকে দরবারিরা ভালো চোখে দেখত না। তাঁদের কাছে দাম ছিল দেবভাষা (?) সংস্কৃতের। কিন্তু এই সংস্কৃতের সাথে জনতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই জনপদের ভাষা ছিল প্রাকৃত (প্রোটো বাংলা)। এর বিকাশের দিকে কোনো নজর দেয়নি শাসকগোষ্ঠী। ড. শহীদুল্লাহ্ বলেন,

---

২৯৭. এ কে এম শাহনাওয়াজ, 'বাংলাভাষা চর্চার ঘাত-প্রতিঘাত', *দেশ রূপান্তর*, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

২৯৮. আবদুল করিম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১১

২৯৯. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ*, পৃ. ৬৫

৩০০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬

৩০১. আবদুল করিম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৪

> তখনকার দিনে বাংলা ভাষার সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়াদের নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। তাই সেন রাজারা বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। রাজার অনাদরে, রাজপুরুষদের তাড়নায়, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ঘৃণায় সেনদের সময়ে বাংলা সাহিত্যের স্রোত একরূপ বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।[৩০২]

চাপিয়ে দেওয়া ভাষা

বামুনদের প্রভাবে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সংস্কৃত ভাষা। সেনরা এই সংস্কৃত-পূজার রীতি কঠোরভাবে জারি রাখে। কিন্তু ঘরোয়া ভাষা হিসেবে সংস্কৃত কখনোই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। কারণ, এটা জনমানুষের ভাষা ছিল না। কেবল সেন যুগেই নয়, 'সংস্কৃত কোন যুগের কথ্য ভাষা ছিল না। পণ্ডিতগণের মতে, তা কৃত্রিম লিখিত ভাষা।'[৩০৩] কেতাবি, পোশাকি ও নিশ্চল ভাষা। 'আর আটপহরিয়া অর্থাৎ ঘরোয়া ভাষা ছিল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত ভাষা।'[৩০৪] এই প্রাকৃত এবং পরবর্তীকালের প্রোটো বাংলার প্রতি ব্রাহ্মণদের ছিল চরম ক্ষোভ। 'তাহার অন্যতম কারণ, প্রাচ্য দেশীয় নরনারীর ভাষা ছিল তাঁহাদের নিকট দুর্বোধ্য, অর্থহীন। অথর্ববেদের ঋষিদের কাছে প্রাচ্যদেশ বহু দূরদেশ; শতপথ-ব্রাহ্মণে এ-দেশের লোকেরা আসুর্য অর্থাৎ অসুরপ্রকৃতি বিশিষ্ট; ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এ-দেশ দস্যুদের দেশ; বৌধায়ন-ধর্মসূত্র রচনাকালেও এ-দেশ অস্পৃশ্যদের দেশ।'[৩০৫]

৩০২. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *শহীদুল্লাহ রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৯

৩০৩. ওয়াকিল আহমদ, *সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৩

৩০৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা*, পৃ. ২-৩

৩০৫. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব), পৃ. ৫৬৭

প্রাচীন বঙ্গের জনসাধারণ ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে অস্পৃশ্য। তাদের মুখের ভাষাকে চিরকালই অবজ্ঞা করে এসেছে বামুনরা। তাই দেশীয় ভাষা ডিঙিয়ে মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল সংস্কৃত ভাষা। এই ভাষায় কাব্য রচনা করতে বাধ্য ছিল সবাই। কিন্তু লোকেরা তাতে সায় দেয়নি। তারা রুখে দাঁড়িয়েছে মাতৃভাষার শত্রুদের বিরুদ্ধে। পণ্ডিতদের দিয়ে জারি করিয়েছে হাস্যকর ফতোয়া :

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।[৩০৬]

অর্থাৎ, যে মানব আঠারোটি পুরাণ আর রামের জীবনচরিত দেশীয় ভাষায় শুনবে, তার ঠাঁই হবে রৌরব নরকে! দেশীয় ভাষা চর্চা করলে নাকি দোজখের সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেওয়া হবে। প্রোটো বাংলা চর্চাকারীদের জন্য বরাদ্ধ থাকবে রৌরব নরক। এই অবস্থায় 'ব্রাহ্মণ প্রভাবপুষ্ট ধর্মভীরু বাঙ্গালীর সাধ্য কি আর বাংলা ভাষায় শাস্ত্র বা সাহিত্য রচনা করে?'[৩০৭] নরকের ভয়েই তো তাদের জীবন বিপন্ন। অবশ্য নরকের শাস্তি পাওয়ার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত কাউকে অপেক্ষা করতে হয়নি। জীবিত অবস্থাতেই তারা পেয়ে গিয়েছিল নরকের স্বাদ। গোটা দেশই হয়ে উঠেছিল রৌরব নরক। বাংলা ভাষায় কাব্য লিখলে হাত নিরাপদ ছিল না। কথা বললে জিহ্বা নিরাপদ ছিল না। হিন্দুয়ানি আগ্রাসনের মুখে চরম দুর্গতি চলছিল দেশীয় লোকেদের। ড. দাশ এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলছেন,

---

৩০৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪

৩০৭. ওয়াকিল আহমদ, *সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২-৩

> ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেনরাজগণ পরধর্ম সম্পর্কে বেশ অসহিষ্ণু ছিলেন এবং তাঁদের আমলের ব্রাহ্মণ্যস্মৃতির প্রসার ও ব্রাহ্মণয় বর্ণাশ্রম-প্রথা অনুযায়ী সামাজিক স্তরবিভাগের রীতি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এই বর্ণানুযায়ী সমাজব্যবস্থায় বেদাশ্রিত জনগোষ্ঠী ছিল অভিজাত এবং বেদধর্ম ও বেদাচার-বহির্ভূত জনগোষ্ঠী ছিল অনভিজাত, অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য।... চর্যাকারগণ ছিলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ, সুতরাং ধর্মাচারের দিক থেকে তাঁরা বেদবহির্ভূত। এই কারণে চর্যাগীতির রচয়িতারা ডোম্বী, কামলি, শবর, প্রমুখ অন্ত্যজ শ্রেণীর ব্যক্তি এবং... অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত।'[৩০৮]

বর্ণপ্রথার নাম করে এই জনপদের অধিবাসীদেরকে তারা একেবারে নাজেহাল করে ফেলেছিল। অথচ, 'শূদ্র ও অন্তঃজ শ্রেণী বলে সমাজের নিম্নস্তরে যাদের ফেলে রাখলো তারাই প্রধানত এ মাটির সন্তান—বাঙালি।'[৩০৯]

চর্যার নিজস্ব সাক্ষ্য

'ধর্মে কর্মে আচারে ব্যবহারে বিবিধ বিধিনিষেধে চর্যাপদের সমকালীন বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য।'[৩১০] আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে অবৈদিক বাংলা অঞ্চলের মানুষ ছিল অচ্ছুত। ফলে স্থানীয় জনতাকে কোণঠাসা করে রাখার প্রবণতা সেনদের মধ্যে ছিল বেশ প্রবল।[৩১১] তাই 'মলেগ্রহী, কুড়ব,

৩০৮. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, পৃ. ৯৮

৩০৯. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, পৃ. ২১৯

৩১০. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পৃ. ৩৪

৩১১. আহমদ শরীফ, 'বাংলা সাহিত্যের সূচনা: চর্যাগীতি', আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭

চণ্ডাল, বরুড় (বাউরী?), তক্ষণকার, চর্মকার, ঘট্টজীবী (পার্টনি), ডোলা-বাহী (ছলে?), মল্ল (মালো?) এবং আরো নীচের স্তরের অধিবাসী পুরুস পুলিন্দ, খস, খর, কম্বোজ, যবন, সুগ্ধ, শবর-এদের জীবন ছিল চূড়ান্ত অভাব, যন্ত্রণা, বেদনা, নিঃস্বতা, শোষণ এবং, নিগ্রহের জীবন্ত ইতিহাস।'[৩১২] এর নিগ্রহের চিত্র আমরা খুঁজে পাই চর্যার বিভিন্ন কবিতায়। ঢেণ্টণপা সেই চিত্র বর্ণনা করে বলছেন :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে যামাঅ॥[৩১৩]

আধুনিক বাংলায় দাঁড়ায় :

টালেতে (বা জনপদে) আমার ঘর, (অথচ) পড়শি নেই।
হাড়িতে ভাত নেই, (অথচ) নিত্য অতিথি।
ব্যাঙের দ্বারা সাপ আক্রান্ত হয়।
দোয়া দুধ কী (আশ্চর্য), বাঁটে টোকে।[৩১৪]

'এই একটি পদাংশই সমকালীন দরিদ্র বাঙালীর নিত্য অভাব ক্ষুধা বেদনা আক্ষেপ-পীড়িত জীবনের বাস্তব করুণ চিত্রের নিদর্শন হিসাবে যথেষ্ট।'[৩১৫] ঢেণ্টণপার এই কবিতা ছিল

---

৩১২. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পৃ. ৩৭-৩৮

৩১৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, পৃ. ৫১

৩১৪. মাহবুবুল আলম, *চর্যাগীতিপাঠ*, পৃ. ১৪৭

৩১৫. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পৃ. ৩৬

তৎকালীন আমজনতার প্রতিচ্ছবি। অনাহারে অবহেলায় এক দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছিল তারা। ক্ষুধার্ত জনতা দুমোঠো ভাত জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছিল বারবার। কারণ, শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে নিচু শ্রেণির বলে গণ্য করে কেড়ে নিয়েছিল মানবিক অধিকার। ড. আহমদ শরীফ চর্যার সমকালীন সমাজ সম্পর্কে বলেন,

> দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেও ধন, বর্ণ ও বৃত্তি বৈষম্যপ্রসূত ঘৃণা-অবজ্ঞা-অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে নি নিম্নবর্ণ নিম্নবিত্তের লোকগুলো। ধন-বিদ্যা-পেশা-পদ ঘরে-বাইরে সর্বত্র বৈষম্যের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর আজো খাড়া করে রেখেছে। তাই নগর বাহিরেই ডোম্বীর কুঁড়েঘরে বাস। এবং নেড়ে (মুণ্ডিত মস্তক) বৌদ্ধ শ্রমণ হয়েও ব্রাহ্মণ পরিচয় ঘোচে নি। তাই শবরেরা চিরকাল অরণ্যে পর্বতে বাস করে। টিলবাসিনী শবরীর প্রতিবেশী থাকে না। সেদিন ফুল্লরাদের হাঁড়িতে ভাত থাকত না। তাঁত-চাঙ্গাড়ি, মাছ-মাংস বিক্রি করে কিংবা তুলা ধুনে অথবা নাচিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে হয়ে হাড়ি ডোম মুচি মেথর বাগদি ব্যাধ কৈবর্ত কাওারীর (ধড়ে প্রাণ বাচিয়ে রাখার মতো) জীবিকা অর্জন করতে হতো। তার বাড়া কিছুতে তাদের চির অনধিকার। উচ্চকোটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল কেবল বেচা-কেনার বা দাস-প্রভুর। সব দেওয়া-নেওয়াই ছিল বাহ্য, বৈষয়িক ও ব্যবহারিক মনের মানসের যোগ ঘটে নি কখনো।[৩১৬]

৩১৬ আহমদ শরীফ, 'বাংলা সাহিত্যের সূচনা পর্বকথা', আবদুস সাত্তার (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩১৬

অধ্যাপক ড. অতীন্দ্র মজুমদার সেই সমাজচিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন,

> "সমাজ যেখানে দরিদ্র্যের প্রতি সহানুভূতিহীন; মানবিকতার মূল্য দিতে অনিচ্ছুক, সেখানে চর্যাপদের কবিরা 'এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণ কপাটের আস' (ইন্দ্রিয়ের পরিপাটের আশা ত্যাগ কর), মোহতরুকে ফেড়ে ফেলে নির্বাণের সাঁকো নির্মাণ করো... ইত্যাদি কথা ছাড়া আর কী বলতে পারেন!... এইসব সাক্ষ্য দেয় সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের প্রতি উচ্চকোটির কী নিদারুণ অবজ্ঞা ও অবহেলা ছিল। বহু গানে জীবনের ভোগ-আকাঙ্ক্ষার প্রতি নিরাসক্তিই সিদ্ধাচার্যরা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, এই নেতিবাচক মনোভাব তৎকালীন অসাম্যের আদর্শে গড়া সামাজিক বিধিনিষেধের নিষ্ঠুরতার প্রতিক্রিয়াজাত।"[৩১৭]

ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা শাসিত সমাজে নিষ্ঠুরতা ছিল চরম আকারে। সাধারণ লোকদের সাথে সাম্য ও মানবিকতার আচরণ দেখায়নি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। যার ফলে ব্রাহ্মণদের প্রতি চর্যার লোকদের বিরাগ ছিল বেশ। 'ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের নানা বিধি-নিষেধকে তাঁরা কঠোরভাবে বিদ্রূপ ও নিন্দাও করেছেন।'[৩১৮] সরহপার কবিতায়ও তা খুবই স্পষ্ট—

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মনাড়িয়া॥[৩১৯]

---

৩১৭. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পৃ. ৩৭-৩৮

৩১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩১৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, পৃ. ১৯

আধুনিক বাংলায় এর অর্থ দাঁড়াবে :

ডোমনি, নগরের বাইরে তোর কুঁড়েঘর।
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস ব্রাহ্মণ ও নেড়েকে।[৩২০]

এ ছাড়া "সরহের বিভিন্ন দোহাতে আমরা আচারিক ধর্ম ও অন্য মতবাদীর চর্চার নিন্দা দেখতে পারি। যথা—'ব্রহ্মনো হি-মা জানন্ত হি ভেদ'—ব্রাহ্মণেরা ভেদ (তাৎপর্য) না বুঝে চতুর্বেদ পড়ে। মাটি কুশ জল নিয়ে অগ্নিতে আহুতি দেয়, নিষ্ফল অগ্নি হোমের কুটধূমে তাদের চোখ পীড়িত হয় মাত্র (আর কোনো লাভ হয় না)।... জৈন দিগম্বরদের প্রতিও সরহের বিদ্রূপবাণ তীক্ষ্ণ : 'দীহ ণকখ জই মলিণেঁ বেসেঁ... জই ণগগা বিঅ মুত্তি সুণহ সিআলহ'...—দীর্ঘনখা নগ্ন ও মলিনবেশী যোগী মাথার কেশ উৎপাটন করে। ক্ষপণকরা মোক্ষের সন্ধানে পথে পথে বৃথাই ঘুরে বেড়ায়। নগ্ন হলেই যদি মোক্ষ মেলে তাহলে শিয়াল কুকুরের মুক্তি হতো। লোমোৎপাটনে মুক্তি সম্ভব হলে যুবতীর নিতম্বও মুক্ত। পুচ্ছগ্রহণেই যদি মোক্ষ মেলে, তাহলে পুচ্ছও মুক্ত, উচ্ছিষ্টভোজনে জ্ঞানলাভ হলে হাতি-ঘোড়াও জ্ঞানী।"[৩২১]

ড. মজুমদারের মতে—চর্যাপদের সমাজ এক 'সুগভীর অন্ধকারের বেড়াজালে' আচ্ছন্ন। তারা যেন 'অভিশাপে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে—কোথাও তার আশা নেই, নিপীড়িতের যন্ত্রণা প্রকাশের নেই ভাষা, মানবধর্মে নেই ক্ষীণতম বিশ্বাস'। সমস্ত অঞ্চল 'মৃত্যুযন্ত্রণায় অভাবদৈন্য-পীড়িত পাবতীর মতো

---

৩২০. মাহবুবুল আলম, *চর্যাগীতিপাঠ*, পৃ. ৫৯

৩২১. আহমদ শরীফ, 'বাংলা সাহিত্যের সূচনা: চর্যাগীতি', আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত). *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬

করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করছে'।[৩২২]

চর্যা হলো বাংলা-ছাড়া

সেনদের বাংলাবিদ্বেষী মনোভাবের কারণে প্রকাশ্যে কেউ প্রোটো বাংলা চর্চা করার সাহস পায়নি। নাম গোপন করে, লুকিয়ে লুকিয়ে চলেছে কাব্যচর্চা। অনেক ক্ষেত্রেই কাব্যকে রাখা হয়েছে দুর্বোধ্য করে, যাতে ভিনদেশি হায়েনারা এর মর্ম উদ্ধার করতে না পারে। নয়তো খুঁজে খুঁজে এই কবিদের নিঃশেষ করে দেবে।[৩২৩] বর্ণহিন্দুদের বাংলাবিদ্বেষী মানসিকতার কারণে 'গোটা সেন শাসন যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের কোনো সুযোগ রইল না। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো চর্যাপদের দোহা গান।'[৩২৪] সেনবংশী হায়েনারা এঁদেরকেও রেহাই দিল না। খুঁজে খুঁজে এই সিদ্ধাচার্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষমেশ দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন চর্যার রচয়িতারা। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> মোটামুটি পুরা দ্বাদশ শতকটাই বাঙলায় কর্ণাটী সেনদের রাজত্বকাল। এঁদের সামাজিক দিক্ থেকে প্রধান দুজন; এক বল্লাল, দুই, লক্ষণ।... দুজনেই বাঙালীর নবসমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন ব্রাহ্মণ্যের বা চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে। সেকালের শূদ্রের ছিল বৃহত্তর সংজ্ঞা : অব্রাহ্মণ মাত্রই শূদ্ররূপে পরিগণীত হত।... বৌদ্ধ হিন্দুত্ব বরণ করলেও সে শূদ্র। এ প্রচেষ্টার ফলে বৌদ্ধদের মধ্যে হয়ত

৩২২. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পৃ. ৩৯

৩২৩. মণিকুন্তলা হালদার, *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*, পৃ. ২৬৭

৩২৪. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, পৃ. ২১৯

অনেকেই হল দেশত্যাগী।[৩২৫]

চরম অত্যাচারের মুখে ভিনদেশে পাড়ি জমালেন বৌদ্ধ সাধুরা। নির্বাসিত জীবন বেছে নিয়েও তাঁরা রক্ষা করলেন মাতৃভাষার আমানত। এ কারণেই নেপালে খুঁজে পাওয়া গেল প্রোটো বাংলার একমাত্র নিদর্শন—'চর্যাপদ'। দেবেন্দ্রকুমার ঘোষের ভাষায়:

> পাল বংশের পরে এতদ্দেশে সেন বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চিন্তা অতিশয় ব্যাপক হইয়া উঠে ও বৌদ্ধধর্মের প্রবাহ বিশুষ্ক হইয়া পড়ে। সেন বংশের রাজারা সবাই ব্রাহ্মণ্যধর্মী, তাঁহাদের রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও অধিকাংশ প্রজাবৃন্দ তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এভাবে রাজা ও রাষ্ট্র উভয়ই বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিমুখ হইলে, বাঙ্গালার বৌদ্ধরা স্বদেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঙ্গালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের দ্বারা সদ্যোজাত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলোও তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার বাহিরে চলিয়া যায়। তাই আদি যুগের বাঙ্গালা-গ্রন্থ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।[৩২৬]

প্রাচীন বাংলায় সেনরা চালাচ্ছিল ধ্বংসযজ্ঞের মিছিল। চারিদিকে হাতছানি দিচ্ছিল রক্তের আলেয়া। অত্যাচারে জর্জরিত প্রাচীন বাংলার জনজীবন একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। প্রাণ বাঁচাতে লোকেরা ছুটে গিয়েছিল পার্শ্ববর্তী রাজ্যে। 'হিন্দুধর্মীয় নেতাদের অপূর্ব কৌশল বাংলা দেশ থেকে প্রাণভয়ে

৩২৫ সুকুমার সেন, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা*, পৃ. ৬১

৩২৬ দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস*, পৃ. ৯-১০

ভীত-সন্ত্রস্ত বৌদ্ধদের এক বিশাল অংশকে তাড়িয়ে তিব্বত, নেপাল, আরাকান, ব্রহ্মদেশের পথে... পাঠাল।'[৩২৭] তারা সেদিন নেপাল-সহ পার্শ্ববর্তী দেশে 'পালিয়ে গিয়ে এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ হতে চর্যাপদের বিলুপ্তি রোধ করেছিল। ব্রাহ্মণ্যরোষে কত বাংলা-বৌদ্ধ গ্রন্থের সেদিন মৃত্যু-সমাধি রচিত হয়েছিল, আজ তার কে হিসাব দিবে?'[৩২৮]

উপসংহার

চারটি অধ্যায়জুড়ে আমরা চর্যাপদ ও এর আনুষঙ্গিক নানা বিষয় নিয়ে আলোকপাত করলাম। আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম—চর্যাগীতি প্রশ্নাতীত কোনো সম্পদ নয়। অ্যাকাডেমিয়াতে নানান আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে বিষয়টি নিয়ে। এখনো সেই ধারা চলমান রয়েছে। হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে। আর এসব গবেষণার মাধ্যমেই সমৃদ্ধ হবে বাংলার জ্ঞানতাত্ত্বিক জগৎ।

নানা মুনি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন চর্যাগীতিকে। তাঁদের ভাষাতাত্ত্বিক যৌক্তিক বিশ্লেষণগুলো সামনে রাখলে বোঝা যায়, চর্যা কোনো একক ভাষার গীতি-কবিতা নয়। বরং বাংলা, মৈথিলী, অসমিয়া, ওড়িয়া ভাষার সম্মিলিত সম্পদ। চর্যা এদের সবার জননী। এখানে যেমন বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে বাকিদেরও। জননী হিসেবে চর্যা তার সব সন্তানদের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। তাই শুধু বাংলার দাবি বহাল রেখে বাকিদেরটা খারিজ করে দেওয়া আসলে ন্যায়বিচার নয়।

চর্যা যখন লেখা হচ্ছিল, তখনো বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র-স্বাধীন

---

৩২৭. পুলক চন্দ্র, *ইতিহাস সাম্প্রদায়িকতা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র*, পৃ. ২৫

৩২৮. ওয়াকিল আহমদ, *সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৮

অস্তিত্ব লাভ হয়নি। বরং স্বাধীন অস্তিত্ব আসতে সময় লেগেছে আরও কয়েক শ বছর। কাজেই, ভাষার অস্তিত্ব লাভের শত বছর আগে রচিত কোনো কাব্য-সংকলনকে সেই ভাষার একক সম্পদ দাবি করাটা পিতার চেয়েও পুত্রের বয়স বেশি হয়ে যাওয়ার মতন বিষয়।

আমরা আশাবাদী, চর্যাকে নিজেদের 'একক' সম্পদ বলে দাবি করার বিষয়টিতে বাংলাভাষী পণ্ডিতগণ আরও বেশি সতর্কতার পরিচয় দেবেন। পাশাপাশি চর্যা বাংলা-ছাড়া হওয়ার কারণ হিসেবে যাঁরা মুসলিম-বিজেতাদেরকে দায়ী করতে চেয়েছেন, তাঁরাও একটু নতুন করে ভাববেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আজম, মোহাম্মদ, 'তথ্য, সত্য ও ইতিহাস' (https ://www.academia.edu/63618549)

২. আজাদ, হুমায়ুন, *কতো নদী সরোবর* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, মার্চ ২০২৩)

৩. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুলাই ২০১৯)

৪. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৫)

৫. আহমদ, ওয়াকিল, *সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য,* (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ)

৬. আহসান, সৈয়দ আলী, *চর্যাগীতি-প্রসঙ্গ,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫)

৭. ইসলাম, এস. এম. রফিকুল, *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : সেনযুগ,* (কলকাতা : রত্নাবলী, ব্রজনাথ মিত্র লেন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯)

৮. করিম, আবদুল, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* (ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, আগষ্ট ১৯৯৯)

৯. কোলে, গদাধর, *বাঙ্গলার ইতিহাস,* (কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)

১০. খান, মোশাররফ হোসেন (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান* (ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার, জুন ১৯৯৮)

১১. গুপ্ত, ক্ষেত্র, *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস* (কলকাতা : গ্রন্থনিলয়, ২০০১)

১২. গুপ্ত, তমোনাশ চন্দ্র দাশ, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তা.বি.)

১৩. ঘোষ, দেবেন্দ্রকুমার, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস* (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী, তা.বি.)

১৪. চট্টোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাচীন, মধ্যযুগীয়, আধুনিক কবিতা* (কলকাতা : নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর ২০১৩)

১৫. চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা* (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)

১৬. চন্দ্র, পুলক, *ইতিহাস সাম্প্রদায়িকতা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৫)

১৭. চৌধুরী, আবদুল মমেন ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০তম সংস্করণ, ২০১৯)

১৮. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (কলকাতা : প্রেসিডেন্সী কলেজ, তা.বি.)

১৯. থাপার, রোমিলা, *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (ঢাকা : হাওলাদার প্রকাশনী, জুন ২০২২)

২০. দাক্ষী, অলিভা, *চর্যা-গীতি ভাষা ও শব্দকোষ* (কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১)।

২১. দাশ, নির্মল, *চর্যাগীতি পরিক্রমা* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ১৯৯৭)

২২. দাশগুপ্ত, বিপ্লব, *বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্ব* (কলকাতা : অরুণা প্রকাশ, মার্চ ২০০০)।

২৩. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *নব চর্যাপদ* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯)

২৪. নাথ, মৃণাল, *চর্যাপদ : ভাষা পাঠ রূপান্তর* (কলকাতা : এবং মুশায়েরা, ১ম প্রকাশ, ২০১১)

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬)

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, *বাঙ্গালার ইতিহাস* (কলকাতা : মনোমোহন প্রকাশনী, ১৯৬০)

২৭. *বঙ্গবাণী*, চতুর্থ বর্ষ, পৌষ, মাঘ, (কলকাতা : ভবানীপুর)

২৮. *বঙ্গবাণী*, পঞ্চম বর্ষ, (কলকাতা : ভবানীপুর, চৈত্র ১৩৩২)

২৯. *বাংলাপিডিয়া*, https ://bn.banglapedia.org/

৩০. ভট্টাচার্য, তারাপদ, *বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা : এস গুপ্ত ব্রাদার্স লিমিটেড, আগস্ট ১৯৬২)

৩১. মজুমদার, অতীন্দ্র, *চর্যাপদ* (কলকাতা : নয়া প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৬৭)

৩২. মজুমদার, রমেশচন্দ্র (সম্পাদিত), *বাংলা দেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (কলকাতা : প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)

৩৩. মহাপাত্র, খগেশ্বর, *চর্যাগীতিকা* (ওড়িশা : ফ্রেন্ডস পাবলিকেশন, ২০১৭)

৩৪. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *বঙ্গপরিচয়*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : ওরিয়েণ্টাল প্রেস, ২রা জুলাই ১৯৪২)

৩৫. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম* (কলকাতা : শ্রীগুরু লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৮)

৩৬. মুরশিদ, গোলাম, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২য় সংস্করণ, ২০২৪)

৩৭. রশীদ, মোহাম্মদ মামুন অর, 'চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার ও গান সংগ্রহের ধারাক্রম', *প্রথম আলো*, ১২ এপ্রিল ২০১৯।

৩৮. রশীদ, মোহাম্মদ মামুন অর, "অনূদিত চর্যাপদ : পাঠভেদ সমস্যা ও 'সন্ধ্যা' ভাষাকে দীপায়ন", *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ : ৫৪, সংখ্যা : ৩, জুন ২০১৭।

৩৯. রহমান, এস. এম. লুৎফর, *বাঙালীর লিপি ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা : ধারণী সাহিত্য সংসদ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬)

৪০. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব) (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০)

৪১. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ভাদ্র ১৩৫২)

৪২. শহীদ, আহমদ, *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা : বর্ণমিছিল, ডিসেম্বর ১৯৭১)

৪৩. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* (কলকাতা : পূর্বাশা লিমিটেড, আষাঢ় ১৩৫৫)

৪৪. শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৯)

৪৫. শাহনাওয়াজ, এ কে এম, 'বাংলাভাষা চর্চার ঘাত-প্রতিঘাত', *দেশ রূপান্তর*, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

৪৬. শাহনাওয়াজ, এ কে এম, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য* (ঢাকা : নিউ নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০২১)

৪৭. শাহেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ, *নতুন চর্যাপদ* (ঢাকা : কথাপ্রকাশ, ২য় সংস্করণ ২০১৯)

৪৮. শাহেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ, চর্যাপদের ভাষা-বিতর্ক : একটি পর্যালোচনা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা : ৯৭, জুন ২০১৮

৪৯. সরকার, সৌম্যেন্দ্রনাথ, *চর্যাগীতিকোষ* (কলকাতা : ২য় প্রকাশ, রত্নাবলী, জানুয়ারি ২০০১)

৫০. সঈদ, শামসুল আলম, *চর্যাপদ : তাত্ত্বিক সমীক্ষা* (ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, তা.বি.)

৫১. সুর, অতুল, *দেবলোকের যৌনজীবন* (কলকাতা : স্বপ্নদীপ, শীতলা সেন, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩)

৫২. সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬)

৫৩. সেন, নীলরতন, *চর্যাগীতিকোষ* (কলকাতা : সাহিত্যালোক, ২০০১)

৫৪. সেন, সুকুমার, *চর্যাগীতি-পদাবলী* (বর্ধমান : সাহিত্য সভা, ১৯৫৬)

৫৫. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৪০)

৫৬. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তা.বি.)

৫৭. সেন, সৌহার্দ্য, 'পৌরাণিক ইতিহাস : আঘোরী/অঘোরী (পর্ব-১)', *The Bengal Mirror*, ২৫ অক্টোবর ২০১৯।

৫৮. হক, মাহবুবুল, *চর্যাগীতি পাঠ* (ঢাকা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি., ফেব্রুয়ারি ২০১১)

৫৯. হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০১৩)

৬০. হক, মুহম্মদ এনামুল (সম্পাদিত), *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ ২০১৫)

৬১. হাই, মুহম্মদ আবদুল (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশং হাউজ, একাদশ মুদ্রণ, জুলাই ২০১০)

৬২. হাই, মুহম্মদ আবদুল (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা* (ঢাকা : ট্রেন্ড ওয়েজ, অষ্টম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৯)

৬৩. হাজারিকা, পরীক্ষিত, *চর্যাপদ* (আসাম : ডালিমী প্রকাশন, গোয়াহাটী, তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৯২)

৬৪. হালদার, গোপাল, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* (কলকাতা : এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ২য় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৩)

৬৫. হালদার, মণিকুন্তলা, *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস* (কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, মাঘ ১৪০২)

ইউরোপিয়ান ভাষার উৎসসমূহ

৬৬. Ali, Muhammad Mohar, *History of the Muslims of Bengal,* vol. IB (Riyadh: Imam Mohammad Ibn-e-Sa'uud Islamic University, 1985)

৬৭. Basu, Sajal, *Jharkhand Movement: Ethnicity and Culture of Silence* (India: Indian Institute of Advanced Study, Shimla, 1994)

৬৮. Bhattacharya, V., *Is it Caryāścaryaviniścaya or Aścaryacaryācaya: Indian Historical Quarterly.* Vol. VI. 19,30.

৬৯. *BBC,* India's temples of sex, https://www.bbc.com/travel/article/20230309-italys-impressive-subterranean-civilisation

৭০. Chatterji, Suniti Kumar, *The Origin and Development of the Bengali Language* (Calcutta: University of Calcutta, 1926)

৭১. Cleary, Thomas Francis, *The Ecstasy of Enlightenment:*

Teaching of Natural Tantra (Red Wheel/Weiser, April 1, 1998)

১২. Datta, Amaresh, *The Encyclopaedia of Indian Literature,* Vol 1, p. 647 (Delhi : Sahitya Akademi publications, 1987)

১৩. Diwakar, R.r., *Bihar Through The Ages* (Bihar: Orient longmans, 1958)

১৪. Eastern Region—Geological Survey of India, *MOI,* Government of India. 24 September 2015. Retrieved 2 May 2015.

১৫. Gopal, Madan, *India through the ages* (India: Publications Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, 1990)

১৬. Husain, S. Sajjad (Edited), *East Pakistan: A Profile* (Dacca: Orient Longmans Ltd, 17 Nazimuddin Road, 8th June 1962)

১৭. Kvaerne, Per (Ed.), *An Anthology of Buddhist Tantric Songs: A Study of the Caryagiti* (Oslo : Det Norseke Vidensaps Akademi, Universitet forlaget, 1977)

১৮. Ladage, Rutu, 14 Temples In India Where You Get A Lot More Than Just The Traditional Prasad, indiatimes.com/culture/who-we-are/14-temples-in-india-where-you-get-a-lot-more-than-just-the-

traditional-prasad-231878.html

৭৯. Mansinha, *Mayadhar, History of Oriya Literature* (New Delhi: Sahitta Akademi, 1960)

৮০. Mazumdar, Bijaychnadra, *History of Bengali Language* (Calcutta: University of Calcutta, 1920)

৮১. Mishra, Jayakanta, *A History of Maithili Literature* (India: Tirabhukti publications. Allahabad, 1949)

৮২. Mojumder, Atindra, *The Caryāpadas: A treatise on the earliest Bengali songs* (Naya Prokash, January 1, 1967)

৮৩. Mukherjee, Tarapada (Ed.), *The Old Bengali Language and Text* (Calcutta : Calcutta University, 1963)

৮৪. Rabindranath Tagore (Ed.), *Visvabharati Quarterly* (Calcutta: Shantiniketan, 1924)

৮৫. Sen, Sukumar (Ed.), *Index Verborum of the Old Bengali Carya Songs and Fragments*, Vol. IX (Calcutta, 1947)

৮৬. Sen, Sukumar (Ed.), Old Bengali Texts or Carya-Gitikoṣa, *Indian Linguistics*, Vol. X, (Calcutta, 1948)

৮৭. Sen, Nilratan, *Caryāgītikoṣa: Fascimile Edition* (Simla: Indian Institute of advanced Study, 1977)

৮৮. Shahidullah, M., *Buddhist Mystic Songs* (Dhaka: Mawla Brothers, 1960)

গ্রন্থপঞ্জি

৮৯. Shahidullah, M., *Les chants mystiques de Kāṇha et de Saraha* (France: Adrien-Maisonneuve 5, Rue de Tournon, 5 PARIS VI)

৯০. Smith, Vincent A., *The Early History of India* (Oxford: Oxford University Press, 1914)

৯১. Wilkinson, Philip, *India: People, Place, Culture and History* (London: Dorling Kindersley, UK, 2008)